KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল- ৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible] ?
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5, 7, 8, 17	Year of Publication : ? ? 1971-72 আশ্বিন সংখ্যা ১৩৮২
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : [illegible] ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

শীত সংখ্যা • অষ্টম সংকলন

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ঃ

অনবদ্য গ্রন্থনায় অপরূপ অঙ্গসজ্জায়

শান্তনু দাসের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন

মধ্যাহ্নের ব্যাধ

দে বুক ষ্টোর, কলকাতা। দাম—চার টাকা

কবিরুল ইসলামের

নবতম স্বাদের ঋজুতম উচ্চারণে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

তুমি রোদ্দুরের দিকে

নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা। দাম—চার টাকা

পলাশ মিত্রের অনুপম কাব্য

ছায়া দীর্ঘতর হয়

মিত্রাণী, কলকাতা। দাম—তিন টাকা

মৃণাল বসুচৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

শহর কলকাতা

অব্যয়, কলকাতা। দাম—দু টাকা

শিশির ভট্টাচার্যের রোমান্টিক মুডের মিষ্টিক উচ্চারণে দ্বিতীয় কাব্যসংকলন

কখনো মুহূর্তের আলো

বাক সাহিত্য, কলকাতা। দাম—তিন টাকা

প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ

জীবন সরকারের প্রথম গল্প সংকলন

কাছিম

শিশির ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ

সত্তর দশকে বাংলা কবিতা

আন্তর্জাতিক মানে * বিদেশী ঢংয়ে * অনুপম অঙ্গসজ্জায়

শিশির ভট্টাচার্যের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ

তবুও তোমার নামে

অন্যদিন

অনাদিন প্রধানত তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক জীবনধর্মী কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিট পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১নং রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পীঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ইম্প্রেশন হাউসঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

●

দামঃ এক টাকা। বার্ষিকঃ চার টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শীত সংখ্যা ১৩৭৮ অষ্টম সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

ভবতোষ দত্ত * সন্তোষকুমার অধিকারী

কবিতা

অখিল দত্ত * অজয় নাগ * অমরনাথ বসু * অশোক হালদার * আলো সোম * আবদুশ শুকুর খান * আবু আতাহার * ইন্দ্রনীল দাশ * কংকন নন্দী * কৃষ্ণসাধন নন্দী * গিরিধারী কুণ্ডু * জমিল সৈয়দ * জিতেশ গঙ্গোপাধ্যায় * জীবন সরকার * তরুণ চৌধুরী * দেবপ্রসাদ মিত্র * নিখিল বসু * নৃপেন্দ্রলাল দাশ * পল্লবকান্তি মিত্র * পূর্ণেন্দু মৈত্র * প্রতিমা সেনগুপ্ত * প্রদীপচন্দ্র বসু * প্রভাত মিশ্র * প্রশান্ত রায় * বাজীরাও সেন * বিপ্লব সেনগুপ্ত * বীরেন্দ্র মিত্র * ভোলানাথ শীল * মণীন্দ্র রায় * মনোজ নন্দী * মহসীন মল্লিক * মহাদেব সাহা * মৃদুল মুখোপাধ্যায় * মৃণাল বণিক * রবীন সুর * রমা ঘোষ * রণজিৎ দেব * রবীন্দ্র গুহ * রবীন্দ্র ঘোষ * রাণা চট্টোপাধ্যায় * রাম বসু * লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় * শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা * শান্তনু গুহ * শান্তনু দাস * শ্যামল মজুমদার * শ্যামল মুখোপাধ্যায় * শিবাজী গুপ্ত * সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় * সমরেন্দ্র দাস * সিকান্দার আবু জাফর * সিদ্ধার্থ পাল * সিদ্ধেশ্বর সেন * সুধাংশু বাগ * সুনীথ মজুমদার * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * সুভাষ সরকার * সুশীল রায় * সৈয়দ কওসর জামাল * স্বদেশ চট্টোপাধ্যায় * হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় * হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় * শিশির ভট্টাচার্য

বিদেশী ভাষা থেকে

ফরাসী

স্যাঁ-ঝঁ প্যার্স্

অনুবাদঃ সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

ফারসী

মির্জা গালিব

অনুবাদঃ শিপ্রা আদিত্য

গুজরাতী

রাজেন্দ্র শাহ

অনুবাদঃ সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

আলোচনা

শান্তনু দাস * জীবন সরকার

'আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে'

সব প্রশ্নের উত্তর নেই। সব সমস্যারও সমাধান হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের জাতীয় জীবনের জটিলতম একটি প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর পাওয়া গেছে। এবং প্রায় দুই যুগ পর বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরতম একটি সমস্যা আজ সমাধানের পথে মোড় নিয়েছে। সত্যি সত্যিই 'একনদী রক্ত' দেওয়ার পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। হিংস্র পরস্বাপহারী পশুশক্তি নিহত হয়েছে এবং জন-গণ-শক্তির বিজয়পতাকা প্রভাত সূর্যের মতই পূবের আকাশে আজ দীপ্তিমান।

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনে ওপারের বাঙালীর বুকের তাজা খুনের সঙ্গে এপারের বাঙালীর মর্মছেঁড়া আবেগ ও সক্রিয় সেবাও অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে ছিল। এই লড়াইয়ে সীমান্তের দুই পারের বাঙালীই তাই আনন্দের সমান অংশীদার। কিন্তু এই মুহূর্তে দুপারেরই কোন কোন মহল থেকে একটা অকারণ রূঢ় জিজ্ঞাসা তুলে ধরা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে স্বাধীন ওপারের নাম আজ যদি বাংলাদেশ হয় তবে এপারে আমাদের দেশের পরিচয় কি হবে? সেটা আর বাংলাদেশ রইল না। ওঁরা (যাঁদের অনেকে হয় তো আমাদেরই সহোদর ভাই বা বোন) যদি বাঙালী হন তবে আমাদের বাঙালীত্ব নাকি খারিজ হয়ে যাবে। হাস্যকর এই মতবাদের প্রষ্টা কোন কোন পণ্ডিতের ফতোয়ায় বিভক্ত দেশের বড়ো টুকরোটারই নাকি দেশের আসল নামটার ওপর বেশী দাবী। অর্থাৎ আমি—শিশির ভট্টাচার্য, এই নামেরই অপর কোন হোমরা চোমরার সাক্ষাৎ যদি পাই তাহলে আমার পিতৃদত্ত নামটা অবিলম্বে বদলে ঘনশ্যাম পোড়েল অথবা ঐ রকম অন্য কিছু নিতে বাধ্য থাকব। এই জাতীয় মতবাদ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা মূল্যবান জানিনে কিন্তু সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিতান্ত অসার এবং অশ্রদ্ধেয়। কারণ তাহলে আজ শুধু রাজনীতিকের খেয়াল মেটাবার জন্যেই হাজার বছরের সাংস্কৃতি বদলে ওঁদের নাম নিতে হয়—বাংলাদেশী ও আমাদের —পশ্চিম বাঙালী।

সাহিত্য-পত্রিকার আসর অবশ্যই রাজনীতির আসর নয়। কিন্তু যেহেতু সাহিত্যই সমাজ জীবনের দর্পণ এবং দেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি সমাজ জীবনেরই অপর পিঠ সেই জন্যেই এই অনধিকার চর্চার অবতারণাটুকু; যাই হোক আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যিক আসরের আঙিনায় আমরা সবাই বাঙালীই থাকতে চাই এবং থাকব। তাই এপার ও ওপারের কাল্পনিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দুপারের কবিদের এখানে একই সুতোয় গেঁথে রাখা হল।

অন্যদিনের এই সংখ্যা (যা নামে শীত সংখ্যা হলেও খাঁটি কবিতা পত্রিকার ঐতিহ্য ও মেজাজ অনুসরণ করে বেরুতে বেরুতে বসন্তকাল এসে গেল)—শতকরা আশী ভাগ কবিতাই পল্লী বাংলা থেকে পাঠানো তরুণ কবিদের রচনা দিয়ে সাজানো হল। অন্যদিনে'র অনুরাগী পাঠকেরা খুশীই হবেন এতে আশা করি। কারণ এটা অন্যদিনের জনপ্রিয়তাই সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটা আবেদন জানিয়ে রাখি। সেটা এই যে, এতো অধিক সংখ্যায় আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে আজকাল কবি ও পাঠক পাঠিকার শুভেচ্ছা বহন করে চিঠিপত্র জমা পড়ছে যে অধিকাংশেরই সময়মতো উত্তর দেওয়া হয়ে উঠছে না। আরও এই কারণে যে উত্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট খুব কম চিঠির সঙ্গেই থাকছে। অনুগ্রহ করে প্রত্যুত্তরের জন্যে দশ অথবা পঁচিশ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন।

নমস্কারান্তে

শিশির ভট্টাচার্য

আধুনিকতার পূর্বসূরী সত্যেন্দ্রনাথ

প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' কিংবা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ-শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে।"

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যাপক এবং বিচিত্র দানের সঙ্গে বাংলা কবিতার রূপসজ্জা-পরিকল্পনাও একটি মহৎ স্মরণীয় দান। বলতে গেলে এটা রবীন্দ্রনাথের প্রায় একারই সৃষ্টি। যখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগের আরম্ভ হয়নি, যখন সাহিত্যে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং তাঁদের অনুগামীদের যুগ চলেছে, তখন উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'র প্রসাধন পরিপাটো ঝলমল করা কবিতাগুলি লিখলেন। সেই কবিতাগুলিতে অন্য বাঙালী পূর্বসূরীর কোনো অনুকরণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্বতা সৃষ্টির আদর্শ পেয়েছিলেন সম্ভবত বিদেশী কবিতা থেকে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবর্তন সহজেই বহু অনুগামীকে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

তবু বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান একটু বিশিষ্ট। তাঁকে কোনো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে রাখলেই চলে না। রবীন্দ্রানুগামী নামে পরিচিত কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে যেমন স্বীকার করেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবকেও তাঁরা শিরোধার্য করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মোহময় প্রভাব থেকে সজ্ঞানে মুক্ত হবার চেষ্টা যে সব আধুনিক কবি করেছিলেন তাঁরাও কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ যদিও স্পষ্ট জীবনবোধের কবি ছিলেন, তথাপি রবীন্দ্র কল্পনার সূক্ষ্ম

ভাবময় অরূপ চেতনার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত অশরীরী সৌন্দর্যবোধ তাঁকেও অভিভূত করেছিল। রূপের আড়ালে অরূপের নিত্যসঞ্চরণ তিনিও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেন যদিও তার পুনরাবৃত্তি করা তাঁর সাধ্য ছিল না। এই বিস্ময়-মুগ্ধতা ও সৌন্দর্যচেতনা অন্যান্য রবীন্দ্রপন্থী কবিদের আচ্ছন্ন করেছে, আর সেই সঙ্গে ভাষা ও ছন্দের সাঙ্গীতিক সুষমা। এ দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, কল্যাণ ও আশাবাদিতা, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সহজ সৌন্দর্য সত্যেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই এঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হল। কিন্তু অনুপ্রেরণা খুব প্রত্যক্ষ ছিল ছন্দের ক্ষেত্রে। সত্যেন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দপরীক্ষা—দলমাত্রা এবং কলামাত্রা ছন্দের নানা রূপ এবং আয়তন প্রচুর পরিমানেই প্রযুক্ত হতে লাগল এইসব কবিদের রচনায়।

কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রপন্থার অনুবর্তন করেন নি, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কতটুকু ঋণ নিয়েছিলেন? আমাদের তো মনে হয় রবীন্দ্রপন্থীদের চেয়ে ভিন্নপন্থীদের ঋণ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে নেহাৎ কম নয়, যদিও সর্বাংশে উভয় গোত্রের ঋণের প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রমনা কবি। নানা আইডিয়াকে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন; নানা আপাতবিপরীত বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে সহাবস্থান করত। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকৃতির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

রবীন্দ্র-কাব্যের রূপসজ্জার কথা বলেছি। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের ভাব-প্রকৃতিটিও মনে রাখতে হবে। এই প্রকৃতি থেকেই বাংলা কবিতার যুগান্তরের অন্যতম উৎসার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উনিশ শতকের প্রচলিত কাব্যধারা থেকে জাতেই আলাদা মনে হয়। এক বিহারীলালকে বাদ দিলে সেকালের সমাদৃত কবিতা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত। সর্বজনগ্রাহ্য করবার জন্য স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। যে আবেগ থেকে কবিতার উদ্ভব, সে আবেগ নিভৃত আত্মমুগ্ধ স্বপ্নসঞ্চরণের আবেগ নয়, বরং সকলের কথা বলে প্রতিধ্বনি তোলার প্রয়াসে সে চিহ্নিত। তখন সমাজ-গঠনের সময়। নানা সামাজিক আশা-আকাংখা উৎসাহ উদ্দীপনা এসে ঢেউ তুলেছে কবিতায়। কবিতা কখনও অবলম্বন করছে ইতিহাসকে, কখনও

করছে পুরাণকে। প্রেমের কবিতায় কবিরা লিখছেন। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' খুবই জনপ্রিয় কবিতা ছিল। তাতে আবেগ ছিল, কিন্তু রহস্য ছিল না। প্রেমের করুণ মাধুর্য, নিভৃত আত্মগুঞ্জন ছিল না। ফলে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতা সমাজ-কল্যাণ কিংবা কোনো সহজবোধ্য নৈতিক আবেদন নিয়েই লেখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ধর্মই দিলেন বদলে। কেমন করে এই পরিবর্তন এল সে ঘটনা পরম কৌতূহল পূর্ণ। জীবনস্মৃতিতে তিনি তাঁর কবিহৃদয়ের জাগরণ বর্ণনা করেছেন। একটি অবারিত প্রসন্ন বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর কিশোর হৃদয় জেগে উঠল। যা কিছু দেখলেন, সব কিছুই এক অপার্থিব মাধুর্যে এবং স্নিগ্ধতায় ছেয়ে গেল। এতদিন তাঁর চিত্ত আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি, এখন দেখা গেল পথ করে নিতে হয় সহজ সংবেদনশীলতা দিয়ে। এজন্য সমাজের চিন্তা-ভাবনার বাঁধাপথ ধরবার দরকার নেই। যার চিত্ত স্বাধীনভাবে জেগে উঠতে পারে, নিজের চোখ দিয়েই সে বিশ্বকে দেখে। সেখানেই তার মুক্তি। তার আনন্দ। সে আনন্দ কবির, সে মুক্তি শিল্পীর। এই মুক্তির আনন্দেই বিহারীলাল একদিন বলেছিলেন 'হোক গে এ বসুমতী যার খুশী তার।'

প্রভাত সঙ্গীতে রবীন্দ্র কবিচেতনার আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। তার প্রধান লক্ষণ ছিল আত্মগত দৃষ্টি। তার পরেই এল বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনা। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে বার বার সৌন্দর্যের প্রয়োজনবিরহিত স্বমহিমার কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, শিল্প যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি সেই কথাটি একেবারেই অভিনব শোনাল আমাদের সাহিত্যে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'কাব্য দেখিলেই ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোন লোভ নেই।'

এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নিয়ে এলেন শুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রেরণা। 'সোনার তরী'তে সেই সৌন্দর্যদেবীই এলেন, চিত্রায় তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে বহু বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়ে দেখা দিলেন। শুধু তাই নয়,

সৌন্দর্যের একটি রোমানটিক তত্ত্বকেও রূপ দিলেন নানা কবিতায়। বাংলা কবিতা নতুন রূপ গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি অনুসরণ করে এলেন ভারতী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের রবীন্দ্রানুরাগী কবিরা নিসর্গ-সৌন্দর্য-বিন্যাসে, সামান্য বস্তুতে অসামান্যকে খুঁজে নেওয়ার আগ্রহে, সহজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার আনন্দে, এবং ছন্দের কারুকলায় ভাষার লাবণ্য রচনায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ফলবান করে তুললেন।*

এই সময়েই এলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' রচনার সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত। 'সবিতা' নামে তাঁর প্রথম কবিতার বইটি বেরোয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তার ভূমিকায় তিনি লেখেন—

'জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদর—প্রকৃতির নিয়ম। তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয়, তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। সত্য বটে, দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই উৎসাহ চাই—বল চাই—জ্ঞান ও সত্যের সমাদর চাই। 'তৃষ্ণার সময় কঠোর সংযম প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দশা। এখন কিসে সকল সময় শীতল সলিল সুলভ হয়—অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে।'

কবিতার বইয়ের এ ধরনের ভূমিকা আজ আমাদের কৌতুকের উদ্রেক করে। জ্ঞান-সত্য, জাতির কল্যাণ-ভাবনা কবিকে অনুপ্রেরিত আজ আর করে না। স্বাদেশিক কবিতার জাতই আলাদা। কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতায় এ সব যুক্তি-প্রদর্শন বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণার অভাবই সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের প্রারম্ভে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য সর্বস্বীকৃত হওয়ার আগেই ঊনিশ শতকীয় কাব্যরীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ এসেছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির গর্ব দেখা দিয়েছে, আবার প্রতীচ্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি অনুরাগে কবিচিত্তের যুক্তি তথ্য ও স্পষ্ট চিন্তা প্রবণতার লক্ষণ দেখা

* পূর্বতন কাব্য ও রবীন্দ্রকাব্যের পার্থক্যের বিস্তৃততর আলোচনা করেছি আমার 'কাব্যবাণী' (১৯৬৭) বইতে। ওই বইতে 'সৌন্দর্যবাদের প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়টি কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন।

যাচ্ছে। 'হোমশিখা' কবিতায় তিনি বললেন,

সৌন্দর্য—কবিতা—আভরণ !
অবশেষে তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।

এই সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভীষ্ট, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল একটি কবিতায় বলছেন,

দিব সত্য যত চাহো ;—ঊনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো !

—'স্বপ্নভঙ্গ', মন্ত্র।

এই সত্য ধ্যানগম্য উপলব্ধির সত্য নয়। জীবনের রূপের আড়ালে যে অরূপের সত্য রবীন্দ্র-কাব্যকে জ্যোতিষ্মান করেছে, সে সত্য অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের নয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঊনিশ শতকের শেষ দশকে সত্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছন নি, যদিও তার আভাস এসে গেছে কোনো কোনো কবিতায়।* কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা বলেছেন, সে হচ্ছে মানুষের বিচারবুদ্ধি প্রত্যয়জাত। তাই বিজ্ঞান-ইতিহাস সমাজতত্ত্বের সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—অধ্যাত্ম বা অতীন্দ্রিয় সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এর যোগ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমনকে গড়ে দিয়েছে ঊনিশ শতকীয় যুক্তিবাদী প্রবণতা। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত এই যুক্তিবাদী যুগমানসের প্রতিনিধিকল্প। পিতামহের প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের কবিমনকে বিশিষ্ট রূপ দিতে কম সাহায্য করেনি। রবীন্দ্রনাথের মতো ধ্যানী মন্ময়ী কবির নিত্য সান্নিধ্যও সত্যেন্দ্রনাথের মনের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

'সবিতা' সত্যেন্দ্রনাথের পঠদ্দশায় গোপনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। সবিতার পর তাঁর সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বেরোল—'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণি মঞ্জুষা', 'অভ্র আবীর'। ১৯২১-এ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেরিয়েছে 'বেলাশেষের গান' ও 'বিদায় আরতি।'

তখন পুরোপুরি রবীন্দ্রযুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিতায় রবীন্দ্রানুগামিতা ব্যাপকতা অর্জন করেছে। ভাষায় ছন্দে ভাবে—সবদিক

* 'চিত্রা' কবিতাটি তুলনীয়।

দিয়ে রবীন্দ্রানুসরণ পরম চরিতার্থতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও তার চিহ্ন ফুটে উঠল। নিছক বস্তুগত বর্ণনা ছাড়াও এবং বিবরণাত্মক ভাব ছাড়াও আত্মদৃষ্টিতে দেখা জীবনচেতনা—রূপোল্লাস ও মগ্নতা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকেও বিশুদ্ধ কাব্যরসে ভরে তুলল। বিশেষ করে 'ফুলের ফসল' বইখানি নানা ফুলের বর্ণ ও রূপভোগে কবির প্রীতির ভাণ্ডারটি খুলে দিল। কবিমানসের বিভোরতা এবং সুকুমার কল্পনাবিলাস সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় একটি নূতন উপভোগ্যতা নিয়ে এসেছে—

এত কাছে থেকে হায় তবু এতদূর।
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর।

এই অনির্বচনীয় সুদূরতা রবীন্দ্রকাব্যেরই সুর। এমনি অনেক কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার মধ্যে প্রচুর।

সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্যসৃষ্টির সমৃদ্ধির যুগে বহু বৈচিত্র্য ফুটে উঠল। রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার সঙ্গে বাস্তব-সচেতনতা, মানব-সভ্যতার মহত্ত্ব নির্ণয়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ আশাবাদিতা, অতীত-গৌরববোধের সঙ্গে সমকালীন আশাবেদনা, ক্ষুদ্র ও দীন জীবনের সার্থকতাবোধের সঙ্গে মহামানবের অনুপম মহিমা; সাধু ও গম্ভীর ভাষাশৈলীর সঙ্গে চলতি বুলি; গম্ভীর ধীরগতি ছন্দের সঙ্গে চটুল দ্রুতগতি ছন্দ—কত বিভিন্ন কল্পনান্তর সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যজগৎকে আমাদের এই বহুবর্ণা পৃথিবীর মতোই শব্দে-গন্ধে-গানে-কোলাহলে পূর্ণ করে দিয়েছে। এটা সত্যেন্দ্রনাথের যেমন গুণ তেমনি আবার দোষ বলেও গণ্য। গুণ এইজন্য যে, কবিচিত্ত একটি অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়, জীবনের সবগুলি দিককেই গ্রহণ করতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ গম্ভীর হতে জানতেন, আবার শিশুর মতো খেয়ালীও হতে পারতেন। তাঁর ভাষার একটি স্টাইল—

বিস্ময়ে বিহ্বল চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ;
আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

আবার আর একটি স্টাইল—

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে মধ্যিখানে নৃত্যখেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

এই বিচিত্ররূপা কল্পনা বিভিন্ন রুচি পাঠককে স্বভাবতই আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। তাঁর বহু কবিতা শিশুচিত্তকে খুশিতে ভরে দেয়; স্বদেশপ্রাণকে উদ্দীপিত করে; রূপরসের সৌন্দর্যপ্রেমিককে মুগ্ধ করে; ভাবুক দার্শনিক মনকে মগ্ন করে। দুঃখবাদী সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পাবেন জীবনের দুঃখরূপ; আনন্দবাদী পাবেন উল্লাস-স্নিগ্ধতা। সাহিত্যের পরিভাষায় এই শ্রেণীর কবিকে বলে অবজেকটিভ।

অবজেকটিভিটি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। নাট্যকারদের মতো কাব্যকারেরও এই গুণ থাকতে পারে। যেমন কীটস। কীটস-এর প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচকের একটি অবিস্মরণীয় উক্তি—He is with Shakespeare মনে পড়ে। শেকসপীয়রের সমধর্মিতা অবজেকটিভিটির সূত্রেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কি সেই অর্থে অবজেকটিভ? অবজেকটিভিটি জীবনের গভীরতাদ্যোতক। সৃষ্টির বাইরের রূপটি কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করলেও অন্তর্নিহিত একটি উদার সর্বসহিষ্ণু প্রশান্তি বিচিত্রকে ভাবৈকরসে সুস্থিত করে। এইজন্য কীটস-এর কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব মিলিয়ে যায়। একটি গভীর অনুভূতিতে মৃত্যু থেকেও নির্বিকার প্রশান্তিতে জ্বালাহীন বেদনাহীন হয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ এই সৃষ্টি জিজ্ঞাসায় কখনই পীড়িত হন নি। অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সত্তা সম্বন্ধে কোনো গভীর প্রশ্ন তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে নি, শান্তও করেনি। তিনি চলতি আইডিয়া নিয়ে ছন্দ রচনা করতে ভালোবাসতেন। ভাষা ও ছন্দের উপর নিরঙ্কুশ অধিকারে, চতুর প্রকাশ ভঙ্গিতে, আন্তরিক উচ্চারণে, তাঁর রচনা উপভোগ্য এবং স্মরণীয়। তিনি অবজেকটিভ নন, তিনি আরটিস্ট এবং ক্রাফটস্‌ম্যান।

এতে তাঁর প্রশংসা, এতে তাঁর সমালোচনা। যে-কোনো বিষয় নিয়ে স্বচ্ছন্দ পদ্য লিখে ফেলতে পারেন, তিনি জর্নালিস্ট-কবি, ঈশ্বর গুপ্তের মতো। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তিনি আলংকারিক বিন্যাসেই যে শুধু নিপুণ তা নয়, তাঁর জাগ্রত মন একটি

সুস্থির চিন্তায় মগ্ন। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন,

'কাব্যের যে প্রবৃত্তিকে ক্ল্যাসিক্যাল বলা হইয়া থাকে, তাহার মূল প্রেরণা মানুষের স্বাভাবিক সমাজ ধর্মনিষ্ঠার মধ্যেই আছে ; একটা কিছুকে স্থায়ী ও দৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস, নিয়ত পরিবর্তনশীল সদ্যধ্বংসী জগতের একাংশে একটা স্থির-সত্তার আশ্বাস—মানুষ চায়……সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও যদি এই জাতীয় হয়, তবে কবি হিসাবে তাঁহার অগৌরবের কারণ নাই'।

সত্যেন্দ্রনাথ নীতি-নিয়মকে ভালোবাসতেন, উচ্চ আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন, মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। জীবন বলিষ্ঠ হবে, সংকীর্ণতা থাকবে না, ঐতিহ্যকে সম্মান করবে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবে—এমনি করেই সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রকৃতির কবিতা লিখলেও তিনি বস্তুতই ছিলেন নাগরিক সমাজের কবি। প্রকৃতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, তার রস-রহস্য, তার নিজস্ব লীলারূপে আত্মহারা তিনি হননি। বরং মানুষকেই তিনি সুস্থ ও সুনিয়মিত জীবনচর্যায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল প্রবল, কিন্তু প্রচলিত সমাজনীতির প্রতি বিদ্রোহ ছিল না। দরিদ্র, পতিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ছিল সীমাহীন, সাম্যের কবিতা তিনি লিখেছেন, তথাপি সমাজকে ভেঙে নিরাকার সমাজ গড়বার কথা তিনি ভাবেন নি। তিনি সংস্কার চাইতেন সমাজের মধ্যেই। সর্বোপরি তাঁর বিশ্বাস ছিল শেষ শুভ পরিণামে। দুঃখবাদ প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো কবিতায় এসে গেলেও তিনি সুস্থ বলিষ্ঠ আনন্দবাদেরই কবি ছিলেন। এ রকম কবি সমাজ ও জাতির হৃদয়-তন্ত্রীতে সহজেই অনুরণন তুলতে পারেন। সেকালে যেমন ছিলেন হেমচন্দ্র, একালে তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়ে চারণ কবি রূপে দেখা দিয়েছেন।

তবু বাংলা কবিতায় এটাই সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়। হেমচন্দ্র চারণ কবি বলে শ্রদ্ধেয় হলেও বাংলা কবিতার স্থায়ী সঞ্চয়ে তাঁর দান কোথায় সেটা নিশ্চয়ই আর-একটা বিচার। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয়তা-বোধের দিনে জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার উদার পরিবেশে তিনিও মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কবিতার শব্দ জগতে ধ্বনিমন্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতি আজও ভোলবার নয়। তিনি নিজে যাদু সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু যাদু রচনার উপকরণ তিনি দিয়েছিলেন।

বাংলা কবিতার শব্দ এবং ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর নিঃসংশয় দান অবিস্মরণীয়। ব্রাউনিঙ যেমন বলেছিলেন Out of three sounds he did not create a fourth but a star—সত্যেন্দ্রনাথ নক্ষত্রের আলো জ্বালেন নি, কিন্তুর ধ্বনির সমারোহ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা এবং শব্দসম্পদ বাংলা কবিতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।

ভাষা এবং শব্দের উপর এমন নিরঙ্কুশ অধিকার সত্যই দুর্লভ। বিদগ্ধ মার্জিত বহু পঠনশীল কবি ছিলেন তিনি। কবিরা শব্দেরই কারবারী। সত্যকার কবিই শব্দ ব্যবহার নিয়ে ভাবেন। যাঁরা আয়ত্তাধীন সদাপ্রচলিত শব্দে সন্তুষ্ট, তাঁদের মানসিক জগৎও সীমাবদ্ধ। তাঁদের অভিজ্ঞতায় অনন্যতা নেই। মাইকেল মধুসূদনের যদি ভারতচন্দ্র—কবিওয়ালাদের ব্যবহারের বাইরে পা বাড়াতে না হত, তাহলে তিনি নতুন স্বাধীন কাব্য অভিজ্ঞতার কোনো পরিচয়ই রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁকে নিয়ে আসতে হয়েছে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ সংস্কৃত কাব্যজগৎ থেকে। তারই ফলে তাঁর কবিতায় একটি ভিন্নতর জগৎ নির্মিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, শব্দ-ব্যবহারে এবং শব্দসৃষ্টিতে নানা বিবেচনাই কাজ করে থাকে। সবচেয়ে বড়ো বিবেচনাই হচ্ছে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। বিশিষ্ট আবেগ ও অনুভূতি নিরুপম প্রকাশে শব্দময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন অসাধারণ শব্দশিল্পী। অজস্র শব্দ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু ক্বচিৎ অপ্রচলিত দুরূহ বা শ্রুতিবিষম শব্দ তিনি এনেছেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাবোধ ছিল—চিত্রকল্প-রচনা। তিনি শুধু শব্দই ব্যবহার করেন নি, তিনি শব্দ দিয়ে কবিতার আলো জ্বালিয়েছেন। সে সামর্থ্য ভিন্নতর এবং উচ্চতর। সত্যেন্দ্রনাথ সেই মহিমায় পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু তিনি পরবর্তী কবিদের হাতে তুলে দিয়েছেন উপকরণ। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি সমর্থক বক্তব্য একালের কবিসমালোচকের কথায় উদ্ধৃত করছি অন্য আর একজন শক্তিশালী কবিকীর্তির সূত্রে।—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলছেন—

'সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস সাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন ঃ তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হলো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে

বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয় যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে। পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না।'

সত্যেন্দ্রনাথের দুরূহ শব্দ প্রয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা কাব্যপাঠকের অবশ্য বিচার্য কিন্তু কাব্যলেখকদের পথ যে তিনি প্রশস্ত করে দিলেন এটা স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্রযুগের অগণিত অনুগামীদের অতিব্যবহার বাংলা কবিতার ভাষাকে জীর্ণ করেছিল, সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল, এটা তো সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা মেনেই নিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথই বাংলা কবিতায় নতুন শব্দব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচিত করে ছিলেন। তিনি লিখলেন,

কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি
ঘুৎকার করে উলুক অসনি

এই বিচিত্র শব্দগুলির ব্যবহারের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা যাই থাক বাংলা কবিতার কবিদের যে সাহস জুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মোহিতলালের কবিতায় এবং আরও পরবর্তী সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের কবিতার দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের অভিযোগ অর্থহীন হয়ে যায়। হয়তো তাঁরা দুরূহ শব্দ প্রয়োগের অনিবার্যতা উত্তম রূপেই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-প্রয়োগই বাংলা কবিতার ধ্বনিকে অনেকটাই পরিবর্তিত করতে সহায়তা করেছিল। যার কান আছে তিনিই বুঝবেন, এ ধ্বনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি নয়। আর একটি বড়ো কথা মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ-প্রয়োগে কল্পনার চেয়েও যুক্তি দ্বারাই চালিত হয়েছেন। ফলে বাংলা কবিতার কল্পনার অতিচার বা নিরবয়ব শূন্যতা দূর করতেও তিনি সাহায্য করেছেন।

যুক্তি বোধ এবং মানসিক সতর্কতা ছিল বলেই সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্নজাতের শব্দকেও প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাকাব্য ভাষায় যে সমৃদ্ধ শব্দসম্পদ দান করেছিলেন মূলত তার প্রকৃতি ছিল সংস্কৃত। 'কল্পনা'র পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যভাষার ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও শব্দ-সঙ্গীতে ছিলেন আকৃষ্ট। কল্পনায় তিনি কালিদাসের যুগে 'পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে' খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। প্রথম প্রিয়াই বটে। লাবণ্যময়ী শব্দপ্রতিমার সন্ধানেই তিনি বেরিয়েছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সেই অপূর্ব প্রবন্ধগুলির প্রধান আকর্ষণ তার শব্দজগৎ। গদ্যও আবৃতিযোগ্য মাধুর্যে

অভিসিঞ্চিত। কাব্যের তো কথাই নেই। কবি যখন বলেন,

মুখ খানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে।

তখন এর চিত্রগুণ একটা আলাদা উপভোগ্য হয় না। ওই ভাষার সঙ্গেই সে জড়িয়ে থাকে। 'নতবৃন্ত' শব্দটির ধ্বনি সৌকুমার্য এবং অর্থসৌকুমার্য এক হয়ে যায়। এই শব্দের পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা কালিদাস-বাণভট্টের রোমান্টিক কাব্যসৌরভ বহন করে নিয়ে আসে। এই ভাষা অতি চমৎকার বটে, কিন্তু এর একটা অসুবিধাও সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের

বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুসরোজে তার জীবন মরণ দুই যোজে!

কিংবা মোহিতলালের

গুলনার-বাগে ফুল বিলকুল
নাশপাতি
গালে গাল দিয়ে লালে—লাল হল
বোসতানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আবছায়া।
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোশগানে!

—এর মধ্যে দিয়ে যে ভিন্নতর স্বাদ এবং অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে উঠেছে তারও তো প্রকাশের ভাষা চাই। কালিদাসীয় সংস্কৃত মূলক শব্দে তাকে প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ।* সত্যেন্দ্রনাথের অভিনবতর সাধনের ফলে বাংলা

* প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, অসাধারণ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ইসলামী শব্দ চয়নের দিকে ঝোঁকেন নি কারণ তাঁর মানস জগৎই ছিল অন্য রকম। মোগলাই বা ফারসি পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি যান নি। 'ক্ষুধিত পাষাণে' আশ্চর্য স্বপ্নজগৎ তৈরি করেছেন, কিন্তু তাতে ইসলামী স্বাদ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র মোগল অন্তঃপুরের বর্ণনা ফারশি শব্দ ব্যবহারে বাস্তবানুগ; এখানেও সেই শিরাজী শরাব, তাতারী প্রহরিণী, ছুরির ঝলক সবই আছে।

কবিতা একটা নতুন শব্দবাহন লাভ করল। সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়োগের পর থেকেই বাংলা কবিতায় এই শ্রেণীর শব্দব্যবহারের পথ সুগম হয়ে গেল। বিষয় হিসাবে তিনি যে বিস্তৃততর ক্ষেত্র পরিক্রমণ করলেন তার প্রেরণা এসেছিল বাস্তব যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি থেকে ; যেমন,

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে
মজ্জাগত গোলাম-সমর্থ শেষ করে দে, শেষ করে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে ;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে !

—এ কবিতায় রোমান্স নেই, সমাজ ও যুগসচেতন বাস্তবানুরাগী মুক্তিবোধ আছে। নজরুল ইসলামের কবিতায় তার সরব অনুসরণ বাংলা কবিতাকে প্রাত্যহিকতার স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এতো স্বপ্নের জগৎ নয়, এ জগৎ ঊষর রুক্ষ ধূলিসমাকীর্ণ কঠিন মাটির। নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালন করলেন। মোহিতলালের 'নাদিরশাহের জাগরণ' 'নাদিরশাহের শেষ' 'বেদুইন' 'শেষ শয্যায় নুরজাহান' প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই গড়ে তোলা হল এক জীবন্ত কাব্যপ্রতিমা।

সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার আর একটি স্তর আছে যার প্রভাবও হয়েছে সুদূর-প্রসারী। কবিতার ভাষায় লৌকিক চলতি শব্দ এবং ভাষাভঙ্গিকে স্থান দিয়ে তার অধিকারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে দিলেন। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথের আগে বাংলা জীবন্ত ভাষার এমন বর্ষণ আর কেউ করেন নি। এখানেও রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। 'ক্ষণিকা'র ভাষাতে কবি লঘু পরিহাস-তরল ভঙ্গিমার দিকে ঝুঁকেছিলেন ফলে মুখের ভাষাভঙ্গি এসে গিয়েছে। এজন্য ক্ষণিকার সুর অন্য রকম। গীতাঞ্জলির কবিতাতে পরিহাস নেই অবশ্য কিন্তু পল্লী-পরিবেশ এবং জীবন ছবি আছে। তবু সত্যেন্দ্রনাথ দুঃসাহসভরে আরও এগিয়ে গেলেন। তিনি এমন সব শব্দ নিয়ে এলেন কবিতায় যা কখনও গ্রাম্য, কখনও আঞ্চলিক। সাহিত্যশিল্প বলতে আমরা স্বভাবতই একটি সর্বরুচিসম্মত, শিক্ষিত জনবোধ্য নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সৃষ্টিই বুঝে থাকি। এইজন্য যে-শব্দ শিষ্টজনের মধ্যে প্রচলিত, সংস্কৃত রীতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই শব্দই সাহিত্যের বিশেষ করে কবিতার বাহন হয়ে এসেছে মধুসূদনের সময় থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য যুগান্তর ঘটালেন। লোকজীবনের শব্দ—যা কাব্যে ছিল অন্ত্যজ, তাকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সাদর

আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তাতে বাংলা কবিতা আরও যেন জনরুচির কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। যাকে খাঁটি বাংলা বলে অর্থাৎ যে ভাষা নিজস্ব ব্যঞ্জনায় এবং প্রকাশক্ষমতায় মৌখিক বাংলাকে সতেজ অর্থবহ করে তুলেছে, সে-সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা অবশ্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইখানি সবটাই তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু কেউ কি ভেবেছিল গদ্যের বাইরে এই দেশজ ভাষাকে সম্মানিত স্থান দেওয়া যেতে পারে ?

তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে
ভব্যতা সে ভিমির্ গেছে ভেপ্‌সে-ওঠা টাকার গোঁজেয় থেকে।

কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, এর মধ্যে তা হয়তো নেই। তথাপি এর ভাষার জোর আছে, মিলের এবং ছন্দের সহযোগিতায় সে ভাষা পাঠক-চিত্তকে প্রভাবিত করে সন্দেহ নেই। সুতরাং লৌকিক বুলি কবিতার ক্ষেত্রে যে আপন স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে আসছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

কবিতা এই ভাষায় হয় কিনা এ নিয়ে কেউ যদি সন্দেহ করেন, তবে সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রময় কবিতাগুলি নিশ্চয় সে সন্দেহ নিরসন করবে। যেমন,

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা পাটি শিমূ।
ইলশে গুঁড়ি ! হিমের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিমঝিম !

এর মধ্যে ছন্দের চপলতা আছে, ভাবেরও কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু রোদ বৃষ্টির এমন ছবিটিরও কি রস নেই ? কিংবা কৃষক-বধূর এই গভীর চোখের চাউনির এমন বর্ণনা চলতি ভাষা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আর কোনো সাধু বর্ণনাতেই তা সম্ভব হত না—

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

এর নাম 'চিত্ররস' দিলে ক্ষতি কী ? রসোপভোগের সেও একটা বৈচিত্র্য।

বাংলা ভাষার এই নিজস্ব বাক্‌রীতিতে এবং শব্দভাণ্ডারে সত্যেন্দ্রনাথ যেন ইচ্ছামতো পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। একদিকে গদ্য ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর চলতি ভঙ্গির দিকে ঝোঁক, আর একদিকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহারিক প্রয়োগ—এই যুগল অভিযান বাংলা সাহিত্যের আভিজাত্যের দুর্গ ভেঙে আধুনিক রীতির প্রতিষ্ঠা করে দিল। তবু মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যতখানি সাহস দেখিয়েছিলেন পরবর্তী কবিরা তা দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া বাংলা ভাষা প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতাও তুলনারহিত বলে মনে হয়। এই দক্ষতা নিয়েই তিনি বহু নতুন শব্দ তৈরি করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাতে সংস্কৃত গাম্ভীর্যের সুদূরতা ছিল না, ছিল জনজীবনের তপ্ত স্পর্শ।

সত্যেন্দ্রনাথের কারুকলার (ক্রাফটসম্যানশিপ) অনুপম উদাহরণ অবশ্যই ছন্দরচনায়। সত্যেন্দ্রনাথ তো আমাদের মধ্যে ছন্দ সম্রাট নামেই সুপরিচিত। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্টতার কথা আমরা সব সময়ে ভেবে দেখি না, কিন্তু ছন্দ শিল্পে তাঁর নৈপুণ্যকে কখনোই ভুলি না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এ দিকটা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন কী আমরা তাঁর শিশুসুলভ ক্রীড়ার জন্যই তাঁকে বাহবা দিই অথবা ছন্দসৃষ্টিতে তাঁর গভীর গুরুত্বের জন্যই সশ্রদ্ধ হই, এ কথা তেমন ভাবি না। তাঁর বহু ছন্দনিদর্শন আমাদের কানকে খুশি করে সত্য, কিন্তু এর পেছনে ছন্দরহস্য সম্বন্ধে কতখানি চিন্তা কাজ করেছে সেটা ভেবে দেখি না। তিনি ছন্দের কারুশিল্পী হতে পারেন কিন্তু শিল্পীকেও ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও ছন্দগঠনের নানা উপকরণ-উপাদানকে বিচার করে দেখতে হয়। কারণ ছন্দকে ভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেই হবে, তা না হলে সেটা ভাষার ভারই হয়ে থাকে, শ্রী হয়ে ওঠে না। সত্যেন্দ্রনাথ নানা সংস্কৃত ছন্দ এবং ইংরেজি ও আরবি ছন্দ বাংলায় নিয়ে এসেছেন। তা ছাড়া পড়তে উৎসাহবোধ হয় এমনি ধরনের নানা ছন্দও রচনা করেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই নিছক খেলা সবগুলিই নয়। এদের গঠনের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষণ প্রবৃত্তি আছে; বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা আছে। সেইজন্য সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ সাধনায় বাংলার ধ্বনি-সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দকৌতূহলের সূচনা অবশ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বাংলা ভাষার তিনটি ছন্দরীতি তিনিই নির্দিষ্ট করে দিলেন; শুধু তাই নয়,

প্রতি ছন্দপদ্ধতির নানা পর্বভাগ, যতিবিন্যাস, পদ ও পংক্তির সজ্জার আদর্শ ঠিক করে দিয়েছেন। কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক ছন্দের নিয়ম বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই আবিষ্কার করেন। বিশিষ্ট কলামাত্রিক পুরনো, সংস্কৃত রীতির মাত্রাবৃত্তও পুরনো কিন্তু মাত্রাবৃত্ত রীতির আধুনিক রূপ (যার নাম সরল কলামাত্রিক) এবং সেকালে ধামালী নামে প্রচলিত আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দ (যার নাম দলমাত্রিক)—দুইই রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রচলিত হয়ে রবীন্দ্রানুগামী কবিদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়াল। সরল কলামাত্রিকের চার থেকে আট মাত্রার পর্ব এবং দলমাত্রিকের চার দলের পর্ব দিয়ে অপূর্ব ছন্দোমাধুর্য রচিত হল রবীন্দ্রযুগে। অন্যান্য কবিদের মতোই সত্যেন্দ্রনাথও বিভিন্ন পর্বের সরল কলামাত্রিক এবং চারদলমাত্রার দলমাত্রিক ছাঁদ দিয়ে কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর মধ্যে আরও নতুন কিছু গড়ে তোলবার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখতে চাইলেন।

এই প্রয়োজনীয়তাবোধ তাঁর বিশেষ করে মনে এসেছিল ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কৌতূহলী পরিচয়ের ফলে। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণকেই বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সাজিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ তৈরী হয়। আবার এই উচ্চারণকালকে মাত্রা হিসাবে ধরে নিয়ে পর্বে পর্বে সমান মাত্রা রক্ষা করেও সংস্কৃতে (এবং প্রাকৃতে) আর এক জাতের ছন্দ হয়। প্রথমটির নাম বৃত্ত ছন্দ, দ্বিতীয়টির নাম জাতিছন্দ। সংস্কৃত ছন্দ মূলতই উচ্চারণ-কালনির্ভর। উচ্চারণ কালনির্ভর মাত্রামূলক জাতিছন্দের বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা সরল কলামাত্রিক ছন্দ।

আবার ইংরেজি ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ অন্য রকম। উচ্চারণকাল তার নিয়ামক নয়, তার নিয়ামক প্রস্বর। প্রস্বারিত-অপ্রস্বারিত ভেদে ইংরেজি ছন্দের বৈচিত্র্য আসে। প্রস্বর পড়ে সিলেবলে, পরিভাষা দিয়ে বলতে গেলে, দলে। বাংলার মৌখিক ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে। লিখিত রূপে নয়, মৌখিক রূপে দল এবং প্রস্বর বাংলা ভাষারও বৈশিষ্ট্য। এই মৌখিক ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে দল-মাত্রিক ছন্দ। বাংলায় যে তৃতীয় আর একটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছন্দ আছে যার নাম বিশিষ্ট কলামাত্রিক, পূর্বে যাকে বলা হত অক্ষরবৃত্ত

ছন্দ—সেই ছন্দে দল এবং মাত্রা দুয়েরই মর্যাদা থাকায় একটি 'ব্যালান্সড' সংযত ধীর ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে—সেটি সাধারণ সংলাপ গদ্যের নিকটবর্তী।

অতএব ছন্দের মূল উপাদান তাহলে কলামাত্রা অথবা দলমাত্রা। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের এই গোড়ার উপকরণ থেকেই নানা ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেন। তিনি যে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় নিয়ে আসতে চাইলেন বাংলা উচ্চারণে অবিচ্ছেদ্য দল এবং প্রস্বরের সঙ্গে মিলিয়েই তাকে আনতে হয়েছে। নইলে বাংলা নিজস্ব ধ্বনি-স্বভাবের সঙ্গে তার মিল হবে না। আবার ইংরেজি ছন্দের প্রস্বরিত দল বিন্যাসকেও আনতে হয়েছে কলামাত্রাসূচক উচ্চারণকালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ছন্দকে নির্দিষ্ট তিনটি রীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই বিন্যস্ত করে দিয়ে গেলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ভেদরেখা তুলে দিয়ে কলামাত্রা ও দলমাত্রা মিলিয়ে নতুন রীতির ছন্দ সৃষ্টি করলেন। এই ছন্দে ইংরেজি এবং সংস্কৃতের ছন্দোধ্বনিকে বাজিয়ে তোলা গেল বাংলার বীণায়।

এবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রচলিত দলমাত্রিক ছন্দের একটি সত্যেন্দ্রনাথ কৃত রচনা—

কলকে ফুলের ০ কুঞ্জবনে ০ জ্বলছে আলো ০ খাসগেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

এর প্রতি পংক্তিতে চারটে পর্ব ; প্রতি পর্বে চারটে দল (সিলেবল)। প্রত্যেক পর্বের গোড়ার দলে পড়ছে প্রস্বর (অ্যাকসেণ্ট)। দল মাত্রিক ছন্দের এটাই আদর্শ গঠন। ক্ষণিকাতে রবীন্দ্রনাথ এর এই গঠনটি স্থির করে দেন ! কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি অপূর্ণ অর্থাৎ দুই দলেরও থাকে।

সরল কলামাত্রিক ছন্দের সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত রচনা—

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, ০ শব নাই—শুধু ০ শিব।
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা
মিলন ধর্মী মানুষে মিলিবে ; এ নহে স্বপনকথা।

এর প্রতি পংক্তিতে চারটি পর্ব ; শেষের পর্বটি অপূর্ণ। এখানে প্রতি পর্বের সমতা (ছয় কলামাত্রা) রক্ষা করা হয়েছে উচ্চারণকাল পরিমাণ দিয়ে, দলসংখ্যা

দিয়ে নয়। সেইজন্য এখানে উচ্চারণ একটু ধীরগতি। যুগ্মধ্বনিগুলি একটু টেনে পড়তে হয় অর্থাৎ তাতে দুইকলা মাত্রার প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন 'মানসী' কাব্য থেকে। প্রাকৃত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে যুগ্মধ্বনি ছাড়াও দীর্ঘস্বরও টেনে পড়া হত, এবং সেইভাবে মাত্রাসংখ্যা সমান রাখা হত ; যেমন জয়দেবের

অহহ কল ০ য়ামি বল ০ -য়াদি মাণ ০ ভুবণং

এতে আছে প্রতি পর্বে পাঁচ কলামাত্রা। কিন্তু এই দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী। সেজন্য এই ছন্দ বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে শুধু যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দলমাত্রিক ছন্দ মৌখিক উচ্চারণভঙ্গিকে আশ্রয় করে থাকে। সেজন্য এতে হসন্তধ্বনির প্রাধান্য। এই দলমাত্রিকের কাঠামো ধরেই সত্যেন্দ্রনাথ কলামাত্রাও বিন্যস্ত করে একটি অভিনব ছন্দ উদ্ভাবন করলেন। 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে তার নাম তিনি দিয়েছেন 'বুলবুল গুলজার ছন্দ'। এর নানা রকম বৈচিত্র্য। এই শ্রেণীর ছন্দে কলামাত্রার রীতিতে দলের প্রসারণ ঘটে বলেই দুই পদ্ধতির মিশ্রণ। কখনও দুটি দল অথচ চার কলামাত্রা। যেমন—

ছিপখান ০ তিন দাঁড় ০
তিনজন ০ মাল্লা ০
চৌপর ০ দিনভর ০
দ্যায় দুর ০ পাল্লা।

কখনও তিন দল চার কলামাত্রা—

রূপশালি ০ ধান বুঝি ০
এই দেশে ০ সৃষ্টি ০
ধূপছায়া ০ যার শাড়ী ০
তার হাসি ০ মিষ্টি।

আবার কখনও তিন দল পঞ্চকলা—

শালিক শুক ০ বুলায় মুখ ০
খল ঝাঁঝির ০ মখমলে।

এমনি করে তিন দল—ছয় কলামাত্রা এবং চার দল—ছয় কলামাত্রা, দুই দল—তিন কলামাত্রা, চার দল—চারকলা, চারদল—আটকলার উদাহরণও আছে। এসব ছন্দকে সোজাসুজি সরল কলামাত্রিক বলার বাধা আছে,

কারণ দলবিন্যাসের নির্দিষ্টতা এবং প্রস্বর-প্রভাবের ফলে এদের ছন্দের ধ্বনি ঠিক সরল কলামাত্রিকের মতো টানা হয় না। এক-দল শব্দ দিয়ে গড়া টানা পদ্ধতির ছন্দটিও এই প্রসঙ্গে কৌতূহলজনক—

শিষ কে দ্যায় গো আজ
তার কি ভিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ সে তার কি পর
চাঁদ সে তার কি তাজ ?

দলবিন্যাস এবং কলামাত্রিক পদ্ধতি মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ অনুবাদগুলিই বেশি করে আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। তার কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর বাংলায় নেই বলে হসন্ত ধ্বনি দিয়ে যুগ্মধ্বনির প্রতিভাস রচনা করতে হয়। তাই তাতে দল বিন্যাসের নির্দিষ্টতা আসে! পঞ্চ চামর ছন্দের অনুবাদ—

মহৎ ভয়ের ০ মরুৎ সাগর ০
বরণ তোমার ০ তমঃ শ্যামল।

এখানে প্রতি পর্বে দুটি দল এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দলটি ব্যঞ্জনান্ত। সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত দলের দুই কলামাত্রা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। ফলে এটা ছয় কলামাত্রার সরল কলামাত্রিক ছন্দ হয়েও দল-প্রস্বরের আধিপত্যযুক্ত। এমনি করে তাঁর আছে মন্দাক্রান্তা—

বন্ধুর মুখ চাও ০ সখা হে সেথা যাও ০ দুঃখ দুস্তর ০ তরাও ভাই
এর কলামাত্রিক ভাগ আট-সাত-সাত-পাঁচ। পূর্বে উদ্ধৃত 'ছিপখান তিন দাঁড়' ছন্দেও নির্দিষ্ট স্থানে হসন্তযুক্ত দল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা সংস্কৃতের দীর্ঘ উচ্চারণেরই স্থলবর্তী। বস্তুত এটা 'বিদ্যুন্মালা' ছন্দেরই অনুবাদ। মূল সংস্কৃতের ছন্দধ্বনি এই রকম—

বাসোবল্লী ০ বিদ্যুন্মালা ০ বহুশ্রেণী ০ শাঙ্গচাপঃ।

সংস্কৃতের আরও নানা ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ দল-কলামাত্রিক রীতিতে অনুবাদ করেছিলেন—মালিনী, রুচিরা, শার্দূল বিক্রীড়িত, তোটক, গায়ত্রী।

আবার, ইংরেজির প্রস্বর বিন্যাস দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ গড়লেন বাংলা ছন্দ, তাতেও কলামাত্রার হিসাবও রইল। বাংলায় প্রস্বর সৃষ্টি হয় হসন্তের দ্বারাই। যেমন—

দুষ্টু সেই লোকটা

সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীর এই প্রস্বর রক্ষা করেই অনুবাদ করলেন সিংহল কবিতাটি—

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর শ্যাম নির্মল তার রূপ
তার কণ্ঠের হার লঙ্কর ফুল কর্পূর কেশ ধূপ।

আয়ামবিক এবং অ্যানাপিস্ট মিশ্রিত সেই ইংরেজি কবিতার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে—

O young Lochinvar is come out of the west
Through all the border his steed was the best.

তাঁর 'পিয়ানোর গান' কবিতাটি ইংরেজির 'ট্রোকী'র অনুসরণেই করা।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দকারুকলা বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। তাঁর মৌলিক দান হচ্ছে দল-কলা মিশিয়ে এক চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দ উদ্ভাবন। এতে বাংলার উচ্চারণ ভঙ্গিমাকে পুরোপুরি কর্ষণ ও কাজে লাগানো হয়েছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এই হসন্ত-ধ্বনিত ছন্দই বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ যেন সেই ইঙ্গিত দিয়েই হসন্ত-আশ্রিত দল নিয়ে তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোথায় যেন একটা ত্রুটি থেকেই গেল। ছন্দের চপলতাই যেন বড়ো হয়ে ওঠে। এর সঙ্গীত বড়ো তরল। সত্যিকারের সঙ্গীত গহন সংযত এবং ধ্বনিত। সে বস্তু তো সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন পরীক্ষায় পাই না। এই সংযম বিশিষ্ট কলামাত্রিক (অক্ষর বৃত্ত নামে পূর্ব পরিচিত) ছন্দেই সহজ। এটি বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন দলমাত্রিককে বিশিষ্ট-কলামাত্রিকের সঙ্গে। এই পরীক্ষা কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে একেবারেই করেন নি তা নয় কিন্তু কতটুকু সার্থক হয়েছিলেন বলা যায় না।

তোমার শুভদিনে জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করছে অখণ্ডীন
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!

এটা পড়তে হয় ধীরগতিতে দলমাত্রিকের প্রস্বর-তীক্ষ্ণতাকে কমিয়ে এনে। ছন্দটা অবশ্য দলমাত্রিকই।

একালের দিনে হসন্তধ্বনি নিয়ে নতুনতর পরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যে এবং আধুনিকতর কবিদের রচনায়।* সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে ছকে বাঁধতে চেয়েছেন; এঁরা ছকে না বেঁধে হসন্তধ্বনিকে শব্দের মধ্যে এবং প্রান্তে নানাভাবে সংকুচিত প্রসারিত করে সংলাপ গদ্য ভঙ্গিমার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

* দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা' পরিচয় ১৩৪৮ ফাল্গুন।'

সন্তোষকুমার অধিকারী

পাবলো নেরুদার কবিতা

প্রথম মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর পরিণতি বিশ্বের চিন্তা জগতে একটা বিশেষ আলোড়ন এনেছিল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই আলোড়নকে আরও গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা গেল। যুদ্ধের আগের পৃথিবীর মানুষের মনে ছিল উনবিংশ শতাব্দীর আশাবাদ এবং আনন্দ ও স্বপ্ন কল্পনা। ১৯১৮র পরের যুগে মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল এক দানবিক যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিতে। তাদের চিন্তা থেকে লুপ্ত হল ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা এবং জীবনের উজ্জ্বল আশাবাদ। তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে জেগে রইলো অমঙ্গল ও এক অশুভবোধের ছায়া। হতাশার যন্ত্রণায় তারা আর্ত বোধ করলো।

অতীতের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস এবং জীবনের সকল মূল্যবোধ যাদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল, তারা চাইলো অতীতের খোলস থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে। শিল্পের ক্ষেত্রে স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল যে প্রচলিত ধারা থেকে তারা বিযুক্ত · এবং বহুতর পৃথিবীর ক্ষেত্র থেকে সরে এসে অনেকাংশে তারা অন্তর্মুখী চিন্তায় লীন। একদিকে যেমন হতাশাবোধ, বিচ্ছিন্নতা, ও অসংলগ্নতায় তাদের ভাবনা ভরে উঠলো, অন্যদিকে তাদের শিল্প ও কাব্যের বিষয় ও প্রকরণে দেখা দিল আত্মমগ্ন স্বপ্নময়তা ও অবচেতন মনের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মনের আধো আলো আধো অন্ধকারময় রূপের প্রকাশের জন্য তাদের সৃষ্টি করতে হল নতুন নতুন প্রতীক ও শব্দ। এই প্রতীক ও রূপকল্পনাগুলি অনেক সময় কবির একান্ত নিজস্ব। ফলে যাঁদের কাছে এর অর্থ সুস্পষ্ট হল না, তাঁদের কাছে কবির রচনা আগাগোড়াই অস্পষ্ট এমনকি অবোধ্য থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। শব্দকেও তারা মূল অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে চাইলো। এমনকি শব্দের ধ্বনি থেকে নতুন প্রতীক সৃষ্টির চেষ্টা চললো। যার ফলে আধুনিক কবিতার ভাষা ক্রমশঃ দুর্বোধ্য বলে মনে হতে লাগলো।

পাবলো নেরুদা, যাঁর আসল নাম নেফতালি রেইস্—তাঁর প্রথম কবিতার বই বার করলেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু যে বইয়ের জন্যে তাঁর কবি খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হলো; সেই Viente poemas de amor y una cancion desesparada অর্থাৎ Twenty poems of love and one of depression প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে।

এই সময় থেকেই নেরুদার ওপরে সমসাময়িক ইউরোপীয় কবিদের আধুনিকতার প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিতে Surrealism এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দুইখণ্ডে প্রকাশিত Residencia en la tierra গ্রন্থের কবিতা প্রতীকীভাষা ও শব্দের ব্যবহারে অনেকসময়েই দুর্বোধ্য।

কিন্তু নেরুদার এই অন্তর্মুখী কবিচিত্তের পরিবর্তন এলো। ১৯৩৬ এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং কবি লরকার মৃত্যু তাঁর মনে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো। তাঁর হৃদয়ে যে কল্পনাপ্রবণ কবিসত্তা লুকিয়ে ছিল, সেই কবি মানসের চেতনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কবি মনে প্রাণে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় দীক্ষিত হলেন। তাঁর ভাষায় ঋজু স্পষ্টতা এলো। তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীর ব্যথিত ও বিধ্বস্ত মানবতার রূপ ধরা দিলো।

বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৯৪৩ সালে চিলিতে ফিরে তিনি মাচু পিচুর পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন। দুর্ভেদ্য এক পাহাড়ের ওপরে দুর্গনগরী ইনকার ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি অভিভূত হলেন। মোট বারোটি কবিতায় তাঁর হৃদয়ের অনুভবকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাঁর চিত্ত আবার স্মৃতির গভীরে প্রবেশ করলো। সামনে এসে দাঁড়ালো প্রাচীন চিলির সেই মানুষ, যে একদিন কর্ণিক হাতে একটির পর একটি পাথর সাজিয়ে এই দুর্গকে গড়ে তুলেছিলো। নেরুদা মাচুপিচুর আকাশ ভেদী চূড়ার অন্তরালে যে মানুষী সত্ত্বা—তার অন্তর্লোকে চিরন্তন এক সত্যের সন্ধানে মগ্ন হলেন।

এই বারোটি কবিতার সংকলন The Heights of Macchu Picchu নামে বেরোয় ১৯৪৫ সালে। অনেকের মতে এই কবিতাগুলিতেই তাঁর কবিমানসের অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য পুরোপুরি পাওয়া যায়।

নেরুদার কবিতা বুঝতে হ'লে কতকগুলি জিনিস জানা দরকার। তাঁর কাব্যে নেরুদা ব্যর্থমূলক শব্দ ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। একই শব্দ ও প্রতীকের দ্বারা তিনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সাড়া তুলতে চান। ব্যর্থসূচক

শব্দসৃষ্টি তাঁর কবিতার সর্বত্রই দেখা যায়। অনুভবের রূপ প্রকাশের জন্যে তিনি বিশেষ শব্দকে বেছে নিয়েছেন। যেমন তাঁর কবিতার মধ্যে পর্যাপ্ত প্রয়োগ পাওয়া যায় earth, sea, air, tree প্রভৃতি শব্দের। তাঁর চিত্রকল্প বিশেষ একটি ভাবনার ধারায় সৃষ্ট। মানুষের প্রবহমান জীবনসত্তার প্রতীক হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন tree অর্থাৎ বৃক্ষকে। তাঁর কবিতায় শস্য, রুটি ও ক্রীতদাসের চিত্র যেমন আছে, তেমনই রয়েছে নগরজীবনের অবক্ষয়ের স্বরূপ। দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যু ও বাস্তবজীবনবোধকে তিনি একভাবেই মেনে নিয়েছেন। শরীরী প্রেমের দাবি তাঁর কাব্যে সোচ্চার।

আমেরিকার শহরজীবনের প্রতি তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা। তাঁর মতে শ্বাশ্বত জীবনধারার যে প্রবাহ নিরন্তর মৃত্যুর সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে, তার কোন অনুভব এই নাগরিকজীবনে নেই। সভ্যতার কেন্দ্র এই নগরগুলি যে একদা ক্রীতদাসের যন্ত্রণার্ত শ্রমের রক্তে গড়ে উঠেছে, একথাও তিনি ভুলতে চান না।

মাচু পিচুর উচ্চতায়

[Piedra en la piendra, el hombre, donde estuvo ?]

পাথরের তলায় শুধু পাথর
কিন্তু মানুষ, সে কোথায় ছিল ?
বাতাসের ভেতর শুধু বাতাস
সে কোথায় ছিল ?
সময়ের বুকে শুধু মুহূর্তের সঞ্চরণ
সেই মানুষ কোথায় ছিল ?

তুমিও কি সেই অস্থির চিন্তার
টুকরো টুকরো ভগ্নাংশ মাত্র ?
দৃষ্টিহীন ঈগলের মত
বর্তমানের প্রস্তর পথ ধরে সেই একই ধরনে
পুঞ্জীভূত শরৎকালীন পত্রগুচ্ছে
আত্মাকে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে
সমাধি ভূমির দিকে এগিয়ে চলেছো ?

অবসন্ন দুই বাহু, পদযুগল অবশ, আর দুর্ভাগ্য প্রিয় জীবন,
তোমার স্বচ্ছ আলোকের দিনগুলি
উৎসব দিনের বর্শাফলকে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারা ;
সেই এক শূন্য মুখ ভরিয়ে দিতেই কি
জীবনের পাপড়িতে পাপড়িতে বয়ে এনেছো অমৃতধারা ?
দেখতে পাচ্ছি দুর্ভিক্ষকে, মানুষের রক্তে জমে ওঠা প্রবাল
দেখছি ক্ষুধা, গোপন পত্রাঙ্কুর,
শব্দহীন ভিত্তিভূমির স্থপতিদের।
দুর্ভিক্ষ, তোমার বিস্ফারিত চূড়াইকি
উঁচু ওই মিনারের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলে ?

তুমি রাজপথে পথে চলেছো ;
আমি জানতে চাচ্ছি,
আমাকে তোমার হাতের সেই খুরপিটা একবার দেখাও—
তোমার এই স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তরিত জীবনাঙ্কুরকে
একবার নাড়া দিই ;
বাতাসের সোপান বেয়ে বেয়ে শূন্যতায়
খুঁচিয়ে দিই তোমার পাকস্থলী
যতক্ষণ না মানুষী অস্তিত্বকে ছুঁতে পারি।

মাচু পিচু
তুমি কি ছেঁড়া কাঁথার ভিত্তি রচনায়
জমিয়ে গেছো শুধু পাথরের ওপর পাথর ?
কয়লার ওপরে কয়লা—যার তলায় জমেছে
ফোঁটা ফোঁটা শুধু অশ্রু ?
আগুনে গলানো সোনা, এবং সেই সোনার বুকে
রক্তের স্ফীতমুখ বিস্তার ?
যে ক্রীতদাসকে তুমি প্রোথিত করেছো এইখানে,
তাকে ফিরিয়ে দাও।
এই মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে আনো বুভুক্ষু মুখের ঠাণ্ডা রুটি।

দেখিয়ে দাও ভূমিদাসের সেই ছেঁড়া কম্বলের টুকরো
তার সেই জানলাটা।
আমায় বলে দাও,—যখন বেঁচেছিল,
সে কেমন করে ঘুমোতো সেই দেয়ালের ভেতরে ?
ক্লান্তিতে বিদীর্ণ হয়ে সেই দেয়ালের নিচে…
সেই দেয়াল…যদি তার পাথরের চাঁইগুলো
ভারী হয়ে উঠতো তার ঘুমের ওপর, যদি সে
তলিয়ে যেতো তার তলায়, .
যেন একটা চাঁদের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে
সমস্ত ঘুমকে তার চোখে নিয়ে !

সমুদ্রের অবগুণ্ঠনের তলায় ব্রীড়াবতী নারীর মত
তোমার আঙুলগুলি যখন…হে প্রাচীনা আমেরিকা,
অরণ্যের প্রান্তদেশ থেকে উঠে যেতো সেই দুর্লভ উচ্চতার দিকে,
বিবাহোৎসবের আলোক বিস্ময়ের সঙ্গে এসে মিশতো
সুতীক্ষ্ণ বল্লম আর ভেরীর বজ্র নিনাদ,
তোমার আঙ্গুলগুলি, তোমার আঙ্গুলগুলিও…
যা বুলিয়ে দিতো গোলাপের স্পর্শ মনে,
নতুন ফসলের রক্ত নিষিক্ত বুক
বদলে যেতো এক উজ্জ্বলতার বুনুনীতে ;
আর এক দুর্ভেদ্য শূন্যতার মাঝখানে
তাদেরই সঙ্গে, তাদেরই সঙ্গে এক গভীর অতলতায়
ঈগলের পুঞ্জীভূত ক্ষুধায় নির্গলিত পিত্ত, আকণ্ঠমগ্ন তুমি
আমেরিকা !

অনুবাদ ঃ সন্তোষকুমার অধিকারী

অখিল দত্ত

অপ্রণয়িনী

হাত উল্টে শুধু ঘুণাই ছড়ালে
অথচ এক কদম এগুলেই পেয়ে যেতে
সোনার কৌটোয় লুকিয়ে রাখা ভ্রমর
তুমি গেলে না।

তুমি বলেছিলে, দুঃখ মোচন হলে
গোলাপ হয়ে উঠবে বুক
বন্দী ভ্রমর মুক্তি পাবে সন্ধ্যামণির বুকে
দুঃখ মোচন হল না।

অজয় নাগ

চাই ঠিকানা

ভাল্লাগে না কবিতা টবিতা
ভাল্লাগে না ঘুমন্ত কাল
সুচিন্তিত ধ্যান ধারণা
রম্য বাতাস বসন্ত কাল
অলস দুপুর শুষ্ক পাতা
ভাসিয়ে জলে চাই ঠিকানা।
ভাল্লাগে না নিঝুম বসত
নাগর নদী নীড় বিছানা
সুখ সজ্জা খোয়াব রসদ
দেয় না কিছুই মুক্ত হাওয়া
অচিন সুরের ঠাঁই অজানা ॥

অমরনাথ বসু

সময়কে নিয়ে

একেকটা সময়কে রাক্ষুসে মনে হয়
চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পাই
হাত পা মুখ নেড়ে অসম্ভব গাল দিই
নিজের শরীরের প্রতি বড় বেশী ঘেন্না হয়
থুতু ছিটোই…
একেকটা সময় বন্ধুর কোনো বিয়োগান্ত ছবি
কুয়াশায় ঢাকা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
অনবরত গা ছমছম্ করে
শীতার্ত মানুষের মত উষ্ণ কাঁথা কম্বলে
চিবুক ঘসি
একেকটা সময়কে নিয়ে খেলা করি
কবিতার মূর্তি গড়ি সর্বস্ব সাজিয়ে,
নিষেধের প্রাচীর টপকিয়ে
চীৎকার করে ছুটে চলি…
মৃত্যুর মত পরম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি…

অশোক হালদার

অনুবর্তন

অনুবর্তন, অতিক্রম না—দীর্ঘ হাঁটা,
নিরালম্ব ক্লান্তি…ঝুরি মেলেনা ভুঁই,
কর্ণে কিন্তু নূপুর নাসারন্ধ্রে যুঁই
অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে জোয়ার ভাটা ;
ক্লান্তি আমার অপনোদন করবে কে সে
ফরমুলাতে আঁক মিলোবে এম্নি মূঢ় ?
অধমর্ণে কে যুগিয়ে খুদের কুঁড়ো
দেউলে হবে, বিকিকিনি করতে এসে !

আলো সোম

বিস্মৃতির অনন্ত সমুদ্রে

প্রেমিকার চোখ দিয়ে যখন দেখি—তুমি
বড় আশ্চর্য সুন্দর, তোমার নিমর্মতা সুন্দর,
প্রতারণাময় তুমি মোহময়। তোমার আলতো
হাতের ছোঁয়ায়, বুকের সেতারে বাজে ভৈরবীর সুর।
তোমার বুকের পলিমাটিতে চিরদিনের জন্য
এঁকে দিতে চাই আমার পায়ের চিহ্ন।
আসলে তোমার কংক্রীট মনে এতটুকু
ধুলো জমে নি। কত নিস্তব্ধ দুপুরে
মুখোমুখি বসে স্তব্ধতার ঝড় উঠেছিল—
সেই ঝড়ে একটি গাছের পাতাও কাঁপেনি
তোমার মনের। কত আশ্চর্য রাত্রির প্রহর
তোমার গুঞ্জনে কেটে যেত মুহূর্তের মতো,
মূল্যহীন ছোট ছোট কথা আজ মনে পড়ে,
আমার স্মৃতির দেরাজে কখন জানিনা এক
একটি রত্নের মতন সাজিয়ে রেখেছি।
সে সিন্দুকের ভারী পাল্লায় আজ মাথা
খুঁড়ে মরি, তার চাবি অবহেলা ভরে
ছুঁড়ে ফেলে গেছ—বিস্মৃতির অনন্ত সমুদ্রে।

আবদুশ শুকুর খান

পুতুল

রাখছি এ জীবন গোরস্থানের ধ্বস নামা কবরে
অদূরদর্শী বিষণ্ণ আয়ু ভাঙা পুতুল
খুলে লুকিয়ে খেলা
আদম ঈভের দেহে
খেলে যাই প্রিয়তম প্রাণ—
অনন্য সুন্দর !

পৃথিবী বিমূঢ় বিস্ময়ে বয়সের কপাল ফাটিয়ে চলে যায়
এক জীবনে পড়ে ছায়া অন্য জীবনে
আলো
একদিন দোদুল্যমান আলোতে পুষ্ট হয়ে ওঠা
দুনিয়ার বিস্মিত যৌবন
তবুও
কার জন্য এ যৌবন নিয়ে বসে থাকা
কোন্ প্রতিশ্রুতি ভরে বুঝতে পারবো
যৌবন মানে ভাঙা পুতুল
মলিন খেলনা
কোন্ পুতুলে হাত রাখলে বুঝতে পারব
যৌবন
বার্ধক্য
জরা
হাতে হাত রেখে খেলে যার অপূর্ব সময়
অথবা
কবরের নীচে ভাঙা তোরঙ্গ খুলে—
খুঁজতে খুঁজতে খেলা··
আর শেষ হয় না !

আবু আতাহার

লোকটার লাশটা

অনেক মানুষের পদক্ষেপে প্রতিমুহূর্ত কম্পিত
সেই পথটাতে—
যাকে কিনা কেউ রাজপথ অথবা জনপথ
বলে থাকে—
লোকটার লাশটা পড়েছিল।
কার লাশ, কে ও, কি জাত, কোথা বাড়ি
নানান প্রশ্নের গুঞ্জন আশেপাশে
কেউ কেউ ফিরেও দেখেনি

চলে এস ভাই, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলার কি প্রয়োজন।
আজকাল রোজ রোজ দশ বিশ খুন
এও শেষ।
যথারীতি পুলিশ এসে লাশটাকে নিয়ে গেল
জামা, প্যান্টের পকেট খুঁজলো
কিছু যদি পরিচিতি পাওয়া যায়,
একটা পেন, বাসের টিকিট, ফালতু কাগজ
রুমাল চিরুণী সিগারেটের প্যাকেট
দেশলাই নেই, একজন পুলিশ বললো,
বোধহয় পথেই ধরিয়ে খায়,
তিনটাকা বাষট্টি পয়সা, আর এটা কি হে চিঠির মতো,
প্যান্টের ডান পকেট থেকে বেরিয়ে আসা
কাঁচা হাতের বানান ভুল লেখা,
'বাবা আজ চকোলেট আনতে ভুলোনা'

ইন্দ্রনীল দাস

সামনে পা ফেললেই

সামনে পা ফেললেই কতকগুলো প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।
দিকে দিকে তোমার ছায়া নেমে আসে নিকটস্থ ভূমির উপর···
উন্মোচিত দেহের উল্লাস অস্বচ্ছ অন্ধকারে
মাথানাড়ে,

তোমাকে একদিন নীল পদ্মের মুখ দেখানোর নেশায়
ঘুম বসেনা চোখে, চিরকাল আমার বৈভবের পাশে
পাশে পাশে অন্ধকারের শব্দ।
গাঢ় লাল পথে গাঢ় লাল পথে
পা ফেললেই কতকগুলো অস্বচ্ছ মুখ
ছায়া ফেলে নেমে আসে নিকটস্থ ভূমির উপর···

স্মরণার্থী ট্রেন

ট্রেনের কামরা থেকে এক একটি দৃশ্যকে শুধু পশ্চাতে ফেলে যাচ্ছিলাম
এক একটি স্বপ্নকে কল্পনার মশালে জ্বালিয়ে আলোকিত
সমর্থিত করবার ছলে
বারবার আকাশ দেখছিলাম
স্মরণার্থী ট্রেন—ওপাশের দরোজায় দু'বছর বয়সের জগা
বাইরে তাকিয়ে শুধু কাঁদছিলো
ঢ্যাবঢ্যাবে চোখের এক কিশোর পুনর্বার মার কাছে
খাবারের থালা ধরে ব্যর্থতার জ্বালা শুঁকছিলো
আকাশ থেকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম
আমাদের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দ্রুততর।
সূর্য পুবে থেকে পশ্চিমে পালাবে
স্মরণার্থী ট্রেন অন্ধকার হাতে নিয়ে পশ্চিম ছেড়ে পুবের যাত্রী
চোখ বুঁজলেই ভেসে উঠে
পোড়ো ভিটে মাটি মাংসাশী জন্তুর মতো কিলবিল স্মৃতি
'কি আনলে হে ? বিবর্ণ ছেঁড়া কাঁথার আবরণে আমি কি আনলাম ?
নয় মাসের খেসারৎ স্বাধীনতা ?
না, কিছুনা স্মরণার্থী শব্দটিকে নিয়ে
আমি শুধু ফিরেই চলেছি ফেরার তাড়ায়।

অন্তর-বাহিরহীন আমি ট্রেনের ভিতর থেকে দেখলাম
হাজার দৃশ্যের অটোগ্রাফ আমার মধ্যেই জমা হয়ে গেলো
পোড়ো ভিটের উপর দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতা নামের
সেই রূপোলী কিশোর।
শেষ স্মরণার্থীটিও ফিরে যাবে স্মরণার্থী ট্রেন
একটি শিবির শূন্য করে আরেকটির পূর্ণতায়
অন্ধকার রাত্রিকে ছেড়ে সকালের সূর্যের আসরে
শেষ স্মরণার্থীটিকে নিয়ে একটি রক্তাক্ত ট্রেন প্রতিদিন
ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যে।

একা

খোলা মাঠে একা দাঁড়ালে
অতি দ্রুত খুলে যায়
ঘরদোর
ক্রমে সেখানে ঢুকে
ফালাফালা চিরে ফেলে
সুখদুখ
তখন আবার অতলে নেমে
পাটহীন কূপ থেকে উঠতে কষ্ট
সেজন্য বিক্ষত বুকে খোলা মাঠে
একা দাঁড়াতে ভয় পাই।

গিরিধারী কুণ্ডু

ঘাতক শাসকের হুকুম

লাঙলের ধারাল দাঁত মাটি কামড়ে
তবু হবে না নতুন শস্য বোনা,
চেঁচামেচি, লাঠালাঠি শুরু
রক্তের ফোঁটায় আগুন নিভু নিভু।

ব্রজবুলি নয়,
ঘাতক শাসকের হুকুম—
তুমিও দ্যাখো আহত পাখির চোখ দিয়ে
খয়রাতী দৃশ্য !
এখন উত্তরবঙ্গের বন্যা আবার আসুক
ভেসে যাক উদ্ভিন্ন জল যৌবন।

ইচ্ছেটা স্বপ্ন ছোঁয়া—
হলুদ ধানের শিষ দুলে দুলে
ছুটির খবর লিখবে নীল কালিতে…
আমরা ধ্বংস স্তূপ থেকে ছুটব সেদিকে
অস্থায়ী ঘরকন্না, ঘরণী নিয়ে।

তা হবে না—
ঘাতক শাসকের হুকুম !

মমি কথা বলবেই

কালো আকাশ
তারও চেয়ে কালো মাটি
প্রান্তিক রেখায় উড়ে আসা জোনাকি
সেই আলোতে দেখবে তুমি—
আমার ঘরের মমি।
নৈঃশব্দের খাঁচায় বন্দী
অনুচ্চারিত কান্না আমি শুনি।
ভেঁপু কই ? টবে ফুল নেই।
অন্ধকার হিমঘর—রোদ্দুর যে সুদূর
মমিদের চোখে জমা জল।
হাউইএর মত কালো আকাশ চিরে
আমি ছুটি। চাবুক খুঁজে ফিরি।
হিতৈষীদের বরফগলা ঝিমিয়ে পড়ি।
ছ্যাকরা গাড়ী টেনে চলি
রোদ্দুর উঠবে মিথ্যে করে রোজই বলি
ইতিহাসের অন্ধকূপ হত্যায় শিউরে উঠি
কিন্তু আজ বোবা হয়ে
মমির মত বসি—অনুভূতির অতীত স্তরে
পরম পুরুষ সাজি।
নিস্ফল হাটে যাওয়া—
পুঁজি নিঃশেষ প্রায়—
তবু বলি—আজ হোক কাল হোক
রোদ্দুর উঠবেই
ভেঁপু বাজবেই
মমি কথা বলবেই।

হন্তারকের চোখ এড়িয়েঃ জানলায়

শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে কারা সব
চলে যায়
চলে আসে
সতত ভ্রাম্যমাণ
পিছনেই সমুদ্যত বাদামের খোসা
হাফপ্যাণ্ট, জ্যোৎস্নার খরগোশ
গলিপথে নির্জনতায় ঊর্ধ্ববাহু হলে
ছিন্ন ভিন্ন ভেঙে পড়ে হৃদি-সরসিজ চাঁদমারি
বৃত্তায়ত কুঁড়ি
ধুলোতে মলিন হয় আমার রাজকীয় পরিচ্ছদ।

হাওড়ার ব্রীজে উঠে কোমর দুলোলে
ঢং ঢং ঘণ্টা দিয়ে কখন যে এসে যাবে দমকল
গাঙ্গেয় বাতাসে ওড়ে উত্তাপ, ময়লা আণ্ডার ওয়্যার
ঝিকিমিকি জলে ভাসে হৃদয়ের শিলা, কর্কের ছিপি।

গভীর নৈকট্যের খাতিরে রাজার মতো আচরণ প্রার্থনা করলেও
কারা সব হন্তারক অন্ধকারে বাধ্য করে লুকোচুরি খেলা ভুলভাল
রুমালের ব্ল্যাক মারকেটিং
ল্যাম্পপোষ্ট থেকে ঝুলিয়ে দেয় আমার মৃতদেহ
হা হা করে হেসে উঠে বিক্রমাদিত্যের কাঁধ খুঁজে গেলে
ক্যানভাসে দৃশ্যমান চোখ আমার চোখের উপর
কালো রঙের তুলি বুলিয়ে দেয়
ঝাউবন দীর্ঘশ্বসিত গলে পড়া চাঁদ
অন্ধকারে বসে থাকে নীলকণ্ঠ পাখী।

ক্রুশকাঠে উৎকীর্ণ অনুশাসন রেখে কারা সব
চলে যায়
চলে আসে
ঠুক ঠুক হাতুড়ি চালিয়ে বাদামের খোসা ভেঙে
জানলায় এঁকে যাই লতাপাতা ফুল পাখী এবং লক্ষ্মীপেঁচার ঠোঁট।

জীবন সরকার

তোমাকে ঘিরে

পিপাসার্ত ঠোঁট ছোঁয়ালে
সোনালী প্রস্রবণ
ভেঙে ভেঙে যায়।

রাত্রির ছায়া
ধরে রাখে মদিরার বিচিত্র আস্বাদ।
তোমার মস্তিষ্কে টুং টাং শব্দ
অসংলগ্ন জালবুনে নিজবাসভূমে যায়।

পাতার শরশর শব্দ
তোমার চলার পথ
অনুসরণ করে।
তোমাকে ঘিরে
আমার নদী—
সাগরের হাওয়া খেলে—
খেলে বেড়ায়।

তরুণ চৌধুরী

ক্লান্তিতে অবসন্ন একটি মুহূর্ত

ক্লান্ততে অবসন্ন চোখে নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভঙ্গিমায় বিছানায় চিৎ হয়ে
ঘরের কড়িকাঠ গুণে যাই
প্রার্থিত এইসব মুহূর্ত
বেঁচে থাকে ভেসে ওঠে
যখন রৌদ্রের ঘ্রাণ ভেসে যায়

ক্লান্ততে অবসন্ন মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ঝোলে
ফুটপাথ মুছে গিয়ে পথ শুধু পড়ে থাকে অপেক্ষায়
পায়ের তলা থেকে পথের উত্তাপ
জুতো ফুঁড়ে শরীর কাঁপায়
রোদ্দুর
বাগানে ঢলে পড়া দুপুর যেমন কাঁপায়

ক্লান্ততে অবসন্ন মনে অসহায় নারীর নিরুত্তাপ চোখ নড়ে ওঠে
এতটা সময় ধরে নিষেধের বাঁধ ছিল যার
তবুও
সমস্ত নিষেধ ভেসে যায় অশ্রুর প্লাবনে
অবশেষে
অসহায় নারীর নিরুত্তাপ চোখে চোখ রেখে বেঁচে থাকি

দেবপ্রসাদ মিত্র

দেখা

এ ঘরেই আসবে সে, প্রতীক্ষায় কাটে দুপুর
হাতের ছোঁয়ায় তার ভাসানে যাবে অন্ধকার
দরোজা আমি বন্ধ রাখি তাই।

চৈত্রের নিঃশ্বাসে ঝরে অপেক্ষার অযুত বকুল !
সন্ধ্যার পথে সূর্যের শব বয়ে গোধূলি আসে
নিঃস্ব ঘর ছেড়ে তখন পথে নামতেই দেখি
সে আছে দাঁড়িয়ে—
সূর্যজ্বলা শরীর ঘিরে তার শ্রান্তি জমে
ক্লান্ত পথে লুটিয়ে পড়ে অভিমানী আঁচল।

রিক্তঝুলি ভিখারীর হাত আমি বাড়াতেই
সে মিশে যায় সন্ধ্যার ছায়ায় ছায়ায়।

নিখিল বসু

বোধন

আমার জন্মের পর প্রথম শংখ বাজালে তুমি

পউষের মরে যাওয়া সোনা ফসল মাথা তুলে দাঁড়াল
ভগ্ন সৌধের' পরে কচিপাতা মুঠো মুঠো হাত বাড়াল
আর জড়ানো শক্ত শেকড় প্রোথিত হল শুকনো মাটিতে
এখন, তুমি গভীর গোপন কোনো ঝড় দাও, অথবা উন্মত্ত স্রোতস্বিনীর
মত্ত মাতাল আবেগ
আমি সভ্যতার মতো মাথা উঁচু করি,
গভীর গোপন অসুখ দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলে
ভূর্জপত্রে লিখে নিই ঃ
'আমার জীবন, তোমাকে আমূল ভালবাসি'

এ তো তোমারই মানস খেলা, আমার জন্মের পর
প্রথম শংখ বাজালে তুমি

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

হাজারো নৈঃসঙ্গে

হাজারো নৈঃসঙ্গে জানি, একটি সুতপা
সকাল
আমাকে দিয়ে গেছে এক ঝাঁক রোদের
সঙ্গতা
করুণ বৃষ্টির বর্ণালি মল্লারে মোজায়েক
কোরে—গেছে ঃ
'আমার রক্তে মা ও বাংলা বহমান
ধ্রুব পংক্তিমালা।'

পল্লবকান্তি মিত্র

রক্তের চাহিদা বর্তমানে

রক্তের চাহিদা সর্বত্র, হাসপাতালে, যুদ্ধের বাজারে
কোন মৃতপ্রায় প্রসূতির, রাজরোগ আক্রান্তের,
কোন দুর্ঘটনাগ্রস্ত অজ্ঞান রোগীর, ইত্যাদি অনেকেরই।
তবে বর্তমানে 'বাঙলাদেশে' অঢেল রক্ত চাই। সুতরাং
ঘুম আর নেই আমার দু'চোখে। বর্তমানে
এইমাত্র আমার ঘড়ির নির্দেশ ঃ 'চারটা দশ'।
আলাপী পাখীর কূজনের আগেই আমাকে
বেরুতে হবে এবং সঙ্গে থাকবে একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি,
হরেক রকম বোতল, কিছু কাগজ আর কলম।
আমি হাঁক দেবো উচ্চস্বরে ঃ
'রক্ত চাই—রক্ত ! আছে নাকি পুরানো রক্ত কিছু।'
আমি জানি, প্রথমে সহাস্যে আসবে না
দুয়ার খুলে কেউ। আমাদের পরিচিত শহরের জনতারা
ভয়ে ভয়ে খুলবে জানলার কপাট কিছু।
সন্ত্রস্ত চোখে গাল দেবে হয়তো বা নিতান্ত পাগল বলে।
কিন্তু আমার প্রতীতি আছে দৃঢ়, আমি তবুও হাঁক দেবো
কাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত ঃ
'রক্ত চাই—রক্ত ! আছে নাকি পুরানো রক্ত কিছু।'

ছায়াহীন

ইতস্ততঃ রুদ্ধবাক স্মৃতির প্রতীক
নিরপেক্ষ পড়ে আছে। আমার স্বরাট রাজ্যে
গুপ্ত এরা আততায়ী যেন। তুলনায় আবিদ্ধ
বর্তমানে আমি আমার সম্রাট।

অন্ধকারে অনাবৃত চক্রান্ত শুনি—
সন্ত্রস্ত বাতাসে এক মৃত্যু ভয় পায়ে পায়ে কাছে এল!
অকস্মাৎ রাজকীয় রোষে মুখোমুখি
দাঁড়ালাম ঃ বললাম 'কি চাস্ ?…

সে কোন আশ্লিষ্ট আকার নয়
ম্লান, ম্লানতর ভালোবাসা যেন
আরও দীর্ঘ ছায়া ফেলে আমার সত্তার
দিকে দিগন্তে হারালো।…

প্রতিমা সেনগুপ্ত

কেন ?

কিছু একটা মেনে নেয়ার মধ্যে
শুধু যুদ্ধ চলতে থাকে আমার বুকের ভেতর।
কিছুতেই বুঝতে পারি না যে—
কেমন করে একটা বাসে উঠতে গিয়ে আর একটায় চড়ে
উল্টো জীবনে চলে যাই
কেন যে এই অদ্ভুত খেলাটা হয় জানি না;
এলোপাথারি ছুটোছুটির মধ্যে
আর কোথাও কোন ঠিকানা খুঁজে পাই না।
কেন ?

সে আছে আত্মারও উপরের তাকে

দেরাজের ভিতরে আজ সে, আত্মারও উপরের তাকে
লাল উর্দিপরা পরিচারক সময়ে ঠিক পৌছে দেয়
দিনের আহার ও নির্মল বাতাস
নীলিমেশ, তুমি ওদের বলো, আমার কাছে চাবি নেই
এ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের
শ্বেতশুভ্র শরীরে যার লেগে থাকে বাদামী মোমের আলো।

জন্মলগ্নে ভীষণ অশুভ ছিল আমার সময়
পোড়োমন্দিরের উঠোনে বহুদিন আগে এক সন্ন্যাসী বলেছিল
আমি নাকি কর্ণের উত্তরসূরী, আজো ভালো করে মনে পড়ে
গৈরিক বসনে তার লেগেছিল বাদামী মোমের আলো
আর, সেই থেকে গড়ে উঠেছিল পোষাকের ঔজ্জ্বল্য শরীরকে ঘিরে

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে পার হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আজ
কবচকুণ্ডল নেই, চেয়ে নিয়ে গেছে শরীরের শেষ উত্তরীয়
তবু চারপাশে আমার অতৃপ্ত মুখের ভীড়, জেনে যেতে চায়
নগ্ন শরীরের ভিতরের নগ্নতা কতখানি মসৃণ হতে পারে!

নীলিমেশ, তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো
আমি চাবি নিতে ভুলে গেছি সন্ন্যাসীর সম্মোহনে, কারণ
এ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের, আর
অনুমতি দিও, গীরজার ছাদে জ্যোৎস্না নেমে এলে
ওরা যাানো সাদা মোম জেবলে দেখে নেয় দেরাজের ভিতর
সে কোথায় আছে!

প্রভাত মিশ্র

সূর্য দেখবো না

ইদানীং আমি বেপরোয়া হ'য়ে উঠি মাঝে মাঝে ত্রস্ত দু'হাতে
কাছেপিঠে যা পাই ভেঙে ফেলি—অলস অনলস সব ঘনিষ্ঠতা
আমার বুকের ওপোর দিয়ে একটা বেশ লম্বা সিঁড়ি
এবং অনেক উঁচুতে সিঁড়ির মাথায় একজন মধ্যবয়সী বিধবা রমণী
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে
ডেকে বলে 'মোহন মোহ-ন' অবিলম্বে উঠে আয় শেষ সূর্য দেখবি যে—

অথচ এখানে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত শরীর
বাজেয়াপ্ত হয়ে গ্যাছে কাল রাত সাড়ে চারটায় যখন
আর কারো জন্যে অপেক্ষা না করে পাশের ষ্টেশন থেকে
চলে গ্যাছে উত্তরমুখী আপট্রেন
আমি এখন কি ক'রে যাবো মা—
আমার পা নেই হাত নেই জবুথবু আমি আমিই কেবল
অন্ধ ভিখিরী কিম্বা উলঙ্গ সম্রাটের মতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আছি
তুমি ঐ সিঁড়ি ভেঙে দাও ভেঙে দাও মা আমি আর সূর্য দেখবো না
বরং ভাঙাচোরা সিঁড়ির মধ্যে থেকে যদি কখনো হঠাৎ
তোমার ঝলসে-যাওয়া মুখ মনে পড়ে যায়
যেন আমি চিৎকার করে বলে উঠতে পারি—
ওখানে দাঁড়িয়ো না মা আর দাঁড়িয়ো না নিচে নেমে এসো
সিঁড়ি ভেঙে গ্যাছে অলৌকিক দাঁড়িয়ে আছো তবু তুমি কিরকম
কেবল আমার জন্যে
না মা না—আমি আর সিঁড়ির ওপোরে উঠে সূর্য দেখবো না।

প্রশান্ত রায়

রক্তের গন্ধ তোমার শরীরেও

রক্তের ছোট্ট নদী মন্থন করে
নিশ্চুপ সতর্ক ব্যাঘ্রের ন্যায় উঠে এসে,
তোমার দেহের নম্র লালিত্যে
স্থির থাকতে পারিনি বুদ্ধের মত।
জড়িয়ে ধরেছি নিরালায় একা পেয়ে
মুখ গুঁজেছি তোমার পাখীর পালকের মত হালকা স্তনে
রক্তের গাঢ় রঙে সীমান্তিনী করার পর—
হঠাৎ নির্বাক আমি—নিঃশব্দ, অবাধ্য
রক্তের গন্ধ তোমার শরীরেও।

বাজীরাও সেন

পাণ্ডুলিপি

—যেখানে তোমার গান,
বাতাসের কণ্ঠের নিবিড়ে সুর হয়ে বাজে,
ফসলের মাঠ সব সিঁড়ি ভাঙ্গে স্বপ্নের সুদূরে ;
ফিরে এসো,—
গভীর রাতের মতো ভীরু ভীরু সুখবাদ দুপুরে।

ফিরে এসো,—
একমুঠো ইতিহাস এনো, জীবনের জটিল ভূগোল
খণ্ড ছিন্ন ইচ্ছার জনতা ;—

অথচ অবাক দেখো,—
পাণ্ডুলিপি হয়ে গেছে, তোমার আমার
আর পৃথিবীর যত ছিল কথা।

চেতনার স্তরে স্তরে

বিদেহী আত্মার হিমেল রাতের হাসি
স্বর্গীয় চেতনার স্তরে স্তরে চোখ আমার
শুকতারা
হৃদয়ের বিপ্রতীপে হাতছানি দিয়েছিল বারেবার
স্বপ্নালু সবুজ বৃষ্টির ছায়া।
রাত্রিক হাওয়া দোলে দেবদারু ঝাউবনে
ভেসে আসে অশরীরী
চাঁপার কোন্ তীব্র মদিরতা
প্রতিধ্বনি কেন শুনি সবুজের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জানি কেন দোল দেয় হৃদয়ের সুপ্ত আবিলতা।
আঁধারের তীর ভাঙ্গে শব্দ শুনি তার
হার মেনে গেল ঐ সূর্যাস্তের শেষ বর্ণচ্ছটা
মালাখানা বুকে নিয়ে শ্মশানের শিখা
হেসেছিল হরিণীর-দ্রুতবেগে
ক্লান্ত তবু বৃষ্টি নিয়ে দরজাখানা দিয়েছিল ঢাকা।
হৃদয়ের রন্ধ্র পথে অবাধ্য সেই রক্ত-মাতামাতি
স্বর্গীয় চেতনা চাঁদ শেষ অর্ফিয়ুস
অদৃশ্য মেঘেরা জানি চলে গেছে দূর থেকে দূর
হৃদয়ের প্রস্রবণে পাখীরা বিরোধ
ঢেউ তুলে চলে যায় শব্দের সুর।
নিষ্প্রাণ নেগেটিভে স্মৃতি জলছবি
কৃতঘ্ন দৃশ্যপটে আলোছায়া রূপ
তাঁর মাঝে ভেসে আসে মৃত্যুর শেষ সংলাপ
শার্সির প্রান্তে, শিশু কুয়াশার খেলা
ভেসে আসে ফুল নিয়ে কল্ম-নদী-ব্যথায় নির্বাক।

ঠিকানা কোথায়

কথার কুহকে এত মায়া কেন
কিছুইতো চিরকাল নয় স্থির অব্যাহত
প্রদোষের ধূসর আলো মনে হয়
ঝরঝরে স্বপ্নভাঙ্গা ঊষা
তবু বারেবারে ছেঁড়াতার জুড়ে
সেতারেতে বৃথা চেষ্টা বাজাবার ইমন কল্যাণ

ভুল বুঝি ফুল হয়ে ফুটেছিলো
রূপকথা অর্ধ চেতনায়
সে যে শুধু কাঁটা
বাস্তবের ডানা ছেঁড়া যাতনায়
পতিতার ছন্দিত ছলনা
সত্যের প্রলেপ মাখা প্রলাপেতে শেষ
আলো আর কালো
খুঁজি সে মোহানা
ঠিকানা কোথায় সমুজ্জ্বল অনন্ত শিখার!

ভোলানাথ শীল

স্থির হয়ে বুঝতে পারি

এই যে স্থির হয়ে শুয়ে আছি, আমার খাটে, ঘর অন্ধকার করে—
হঠাৎ আলো জেবলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে?
কি জবাব দেব তারে, চিন্তার কি শেষ আছে—ভাবি মনে মনে।
কত রাত্রি পার হয়ে যায়—শুধু চেয়ে আছি—অন্ধকারের দিকে
পেঁচাগুলো খেলা করে মাঝ রাতে, বীভৎস রূপ গুলি দেখে ধন্য হই
পর্যটকের মত আমি একা, তারপর···
মৃত্যুর জন্যে কান্না, যৌবনের জন্য বিবাহ, হাসিতে ভাল লাগা

সৌন্দর্যের তারিফে মুগ্ধদৃষ্টি দেওয়া, মানসিক প্রতিক্রিয়া
কিছু স্পর্শের জন্যে অস্বীকার করা, সুপ্তমনের ইচ্ছা
কি জবাব দেব তারে
মাকড়শার জালে এ আমার ইণ্টারভিউ, চেতন অচেতনের ডাকে
তাতে বিরক্তির চিহ্ন নেই, আছে ক্লান্তি
কথাগুলো মোলায়েম ভাবে বেরিয়ে আসে
দৃষ্টিটা অন্তর্ভেদী বলে
আমার বাক্সটা খুলে কিছু শব্দ লেখার অন্বেষণে
হোক রাত্রি একটা, তিনটে কিংবা চারটে
এই উচ্ছ্বাসটা আজকাল আনন্দে প্রখর হয়ে দেখা দেয়
কি জবাব দেব তারে
এ অস্বাভাবিক, অপরাধ—প্রতারণা নয়
সূক্ষ্ম বুদ্ধির পদ্ধতিটা রিজাইন দেয় না—
দুর্নিবার গতিতে চলেছি আমি, এই বুদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে
কত দূর এলো দেখবার জন্যে পিছনে দেখি
হঠাৎ আলো জেবলে ওঠে···
আমি স্থির হয়ে শুয়ে পড়ি
ঘুম থেকে উঠে—মৃত্যুর আশ্চর্য অর্থ বুঝতে পারি—

মণীন্দ্র রায়

অমাবস্যার গান

তোমার মনের এই পাশে আমি একা
এই শীতে, এই অন্ধকারে—
যেন শিরদাঁড়ায় কেঁপে ওঠা শত শত সাপের জিহ্বায় নাজেহাল,
যেন আকাশজোড়া মড়ার খুলির নাসিকাহীন গহ্বরে বন্দী,
আর চোখ মেলে দেখছি তোমার মনের অন্য পাশের ঐ জ্যোৎস্না,
যেমন করে দেখেছিল নরক থেকে শয়তান
তার স্বর্গ, তার প্রেয়সী, তার উল্লাস—
আমি নির্বাসিত।

আহ্ কী আরাম তোমার নরম আদরের সুখস্বপ্নে
ঐ জ্যোৎস্নায় ঐ ধোঁয়ার মতো হাল্কা নীলে—
যেন মসলিনে শরীর ঢেকে তুমি নারী
পৃথিবীর মতো শুয়ে আছো দিগন্তজোড়া বিছানায়,
আর শত শত কবি আর শিল্পী
আনন্দের তীক্ষ্ম ছুরির আঘাতে চিৎকার করে উঠছে রক্তে আর বিস্ময়ে,
আর তার প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠছি আমি
পাহাড়ের খাঁজে বসা ঈগলের মতো,
অথচ নামতে পারি না পাখা মেলে তোমার ঐ বুকে,
আমি অসহায়।
কেমন করে তবে
বন্দনা রচনা করি, নারী, আমি তোমার প্রেমিক
যখন মরতে থাকি আমার ইচ্ছায়, আমার চেতনায়—
আমি হারিয়ে যাই ;
কেমন করে পলাশের খুশি জ্বলে ওঠে আমার ফাল্গুনে,
যখন আধখানা শরীরে আমার মরা ডাল—
যদি না প্রতিবাদ করে উঠি তোমার ঐ ভিক্ষার, ঐ উপেক্ষার,
যদি না এই অন্ধকারের রাজতে আমি সম্রাট,
তোমার ছুঁড়ে দেওয়া আঘাতকে মুঠোতে লুফে নিয়ে
তোমার সমান হই।

রেখে গেলাম তাই আমার এই তৃষ্ণা, এই দাহ।
তোমার পূর্ণিমার বিপরীতে আমি শয়তান,
এক আগুনহীন অন্ধকারের জ্বলন্ত অমাবস্যা
আয়নার মতো টাঙিয়ে দিলাম তোমার সামনে,
তুমি মুখ দেখো।

মনোজ নন্দী

দুঃখের জন্যে

কলঘরেয় পাশেই ঝুলবারান্দায় ক্লান্ত কাকের মত ঝিমচ্ছে
হলুদ রোদ্দুর অহল্যার তরল সবুজ দুঃখ
কলঘরের পাশেই ঝুলবারান্দায়—

অর্ঘ্যহাতে
এতদ্রুত শাপমুক্ত হতে চাও তুমি ?
এতদ্রুত আশ্রমের কাছাকাছি ফিরে যাবে ?
হলুদ রোদ্দুর তরল সবুজ দুঃখ সবফেলে ?

বরং এইদিকে এসো এইখানে—
আমি বুকের ভেতর পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে
তোমাকে নির্জন সমাধি দেখাবো ।

মহসীন মল্লিক

সুখ

আলোর অন্বেষায় আহত আঁধার
জীবনটাই জীওনো জানোয়ার ।
তোমার তুহিন তুষারে তোলপাড়
আমার আনন্দ অযুত ।

কখন, কোথায়, ক্রমশ করুণ
স্মৃতির সুপ্তির সুজনতায়,
গহীনগুহার গড়ানো গ্রীবায়
হারিয়েছি হাজারো হৃদয় ।

মাধবীমনের মধু মেখে, মেখে
শিহরণে শীতল শরীর
এখন একটু এড়িয়ে এসে
নেশায় নির্লিপ্ত, নৈঃশব্দেনীল ।

মহাদেব সাহা

তার বুকে আছে

তার বুকে আছে স্বর্ণচাঁপার গাছ, আকাশের মতো
বড়ো নীল পোস্টাপিস
সব যোগাযোগ, নিরুদ্দেশ মানুষের তারবার্তা, জরুরী খবর
বৃষ্টির কালো জামা পরে সেখানে লুকিয়ে থাকে তাড়িত ফেরারী
তার বুকে ট্যুরিস্টের নিশ্চিত শেল্টার আছে ; অসুখী লোকের আছে
সবুজ শুশ্রূষা
বনের চোখের নিচে যারা পাখির পালক খোঁজে, আসে
বনবিভাগের লোকজন জেনে নিতে গাছের বয়স, উদ্ভিদ কিভাবে বাড়ে—
অথচ সবাই তারা ফিরে যায় প্রকৃতির জড় ব্যবহার দেখে
এই সব হন্যে মানুষ এসে তার বুকে খুঁজে পায় সমস্ত পাখির বাসা,
নিসর্গের নীল টেলিফোন শোনে
দেখে উদ্ভিদের নিজস্ব হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি,
পাখির পালক দিয়ে নির্মিত গার্মেণ্ট
তার বুকে আছে
অরণ্যের চিত্রকলা, গোপন স্টুডিও ;
তার বুকে আছে দেরী করে ঘরে ফিরে ডাক দিলে যে দেয় দুয়ার খুলে
সেই ভালোবাসা,
যে এসে ভীষণ জ্বরে মাথায় কোমল হাত রাখে, সেই দুঃখবোধ
তার বুকের মধ্যে বাস করে রাজ দম্পতির সুখ, দুঃখী
বালকের কান্নার সংগী,
যখন শহরে বাধে গোলযোগ, ধর্মঘট হরতাল চলে
যানবাহন বন্ধ থাকে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়
ঝাঁপফেলা দোকানপাট দেখে মনে হয় সমস্ত শহর
যেন মৃত রবিবার
তখনো দাঁড়িয়ে দেখি তার বুকে খোলা আছে জরুরীলারী শপ, ফুলের দোকান
আকাশের মতো সেই বড়ো নীল পোস্টাপিস,
তার বুকে আছে
গোপনীয় খান হাতে সোনালী পিয়ন ।

মৃণাল বণিক

জল্লাদের মোমবাতির দোকান

অনুভূতির রোয়াক জুড়ে মেঘ জমছে
এক হাতে অকেজো লণ্ঠন   হাঁটুর ওপর
আলো   হিম ঝরছে টুপটাপ
বিবর্ণ বউ মধ্য চল্লিশেই   তারই জন্য
এখন দুঃখ গলে যায়
এক হাতে অকেজো লণ্ঠন
অন্ধপরী গান গায় শোনো
হিম ঝরছে টুপটাপ   হাঁটুর ওপর
আলো   ইতস্তত পড়ে আছে
নীল দীর্ঘশ্বাস   একদিন আকরিক
ষ্টিমুলেণ্ট ভাব মধ্যরাতে নিশ্বাস তাড়াতো
দুড়দাড় ফেটে যেতো শিমুল কাপাস
এখন   বিবর্ণ মধ্য পঞ্চাশে
গীর্জ্জার উল্টোদিকে এক জল্লাদ
মোমবাতির পসরা সাজায়

মৃদুল মুখোপাধ্যায়

একদিন কোনদিন

একদিন কোনদিন ইচ্ছেগুলি মৃত হলে পর
স্বচ্ছন্দে পোষাক সব পাল্টে নিতে পারি
সূর্যকে আঁকড়ে ধরে নৃশংস উল্লাশে পারি
রাত্রির তরলতম সমুদ্রের নরক গভীরে
নেমে যেতে ধীরে ধীরে বর্বর আদিম।
অন্তত হলফ করে বলা যায় যৌবনের নিয়ন-ডায়াসে
এ হাতে ও হাতে দুটো লাল বল নিয়ে

যে যাদু দেখাবো বলে প্রকৃত প্রস্তুত
সেই যাদু কোনক্রমে কোনদিন চতুর করাতে
রক্তাক্ত সত্তায় যদি অপদস্থ হয়
তাহলে নির্ঘাৎ সব আলোগুলি একে একে
নেভাবো তখন।

রণজিৎ দেব

জেগে থাকে দুচোখ

পথের ধুলো উড়িয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে
ভীড়ের মধ্যে সারাক্ষণ দুচোখ   কোথায় জ্বলে নীলশিখা
এস্কিমোর শ্লেজগাড়ি চলে
বরফের উপর জেগে উঠছে ক্রমশঃ
প্রচণ্ডতায়

ফেরধার ভয়ে হাঁটতে হাঁটতে পদোপিসীর টলটলে শরীর
দুচোখ
পথের ধুলো উড়িয়ে আসে
পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে বসে থাকে দীর্ঘদিন

সংগীতের মতো নিভৃত আনন্দ এক
শীতের প্রচণ্ডতায়   বরফে
এস্কিমোর শ্লেজ গাড়ি চলে
পথের ধুলোয় নিষ্ঠুরবোধ আশ্চর্য যন্ত্রণা
রৌদ্রদিনে   কোথায় জ্বলে নীলশিখা
নামধরে ডাকতে ডাকতে   কৃষ্ণচূড়া
জেগে থাকে দুচোখ

মহানন্দা

এই সব প্রগলভতা আরোপিত ইচ্ছার প্রচ্ছদে,
কেন কষ্ট কল্পনার অলীক ইমেজ সমর্পিত
নির্মাণের রাত্রিদিন লাবণ্যের বিরুদ্ধ স্বভাবে···

আলো নেভালেও ঘরে কখনও কখনও নিরপেক্ষ ইচ্ছা অনিচ্ছায়
রাত্রির ঘুমের সঙ্গে অন্ধকার
অনায়াসে নষ্ট করে কতিপয় স্বপ্নের জোনাকি

অথবা জোনাকি নয় নীলাভ জ্যোৎস্নার স্বপ্ন ম্লান' ফটোগ্রাফে
স্মরণীয় অত্যাচারে ভৌতিক আবহ
যখন যেদিকে অনুভব
জানালা-দরজা-বন্ধ ঘরে অনর্গল কড়া নড়ে
রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে
কিছুতেই কুলুপ খোলার আলস্য কাটে না

আলস্যের সারাৎসার ঘুম নেই বিছানায় যদি কোনোদিন
স্তূপ স্তূপ অন্ধকার নষ্ট করে নীলাভ জোনাকি
যদি স্টিলট্রাঙ্ক ভেদ করে থ্রি-এক্স রামের গন্ধে এ যাবৎ
যাবতীয় চিঠিপত্র কাঠের সারসগুলি উদ্ভূত আকাশে
ঘরময় শূন্যতায় হাহাকারে ডানা মেলে
যদি মুণ্ডহীন ভেনাসের দুস্থ কুলুঙ্গির পরিহাসে
ফুলের সময় জাগে অবাক হব না
প্রজাপতি শোঁয়াপোকা
কে আগে কে পরে কেউ তা জানে না।

প্রকৃত ব্যাপার

অন্ধকারে আর আমি ফানুস খুঁজব না, অন্ধকারে ছেঁড়া
লাল রিবন ঝুটো মুক্তো
বিষণ্ণ দিনের শেষে সুখী সন্ন্যাসিনী আসে
বৃদ্ধের ঘরে—ঘনিষ্ঠ দেখাশুনা
কিছু অন্য মনে কিছু স্থির মনে
অতঃপর তীব্র জলধারা আহত চোখের ওপর বুকের ওপর
ভেঙ্গে যায় ডানা
চারদিকে এত লুটপাট—বয়স্কের অলজ্জ আচরণ
মঞ্চ থেকে নেমে আসে অবাধ্য বানর
তুমিও কি ক্ষুধার্ত খুব ?
পুরনো দিনের জুতো—হাতঘড়ি—বুকের বোতাম
অনায়াসে বদলে নিই
পরিবর্তে লাল রিবন ঝুটো মুক্তো
ওহে আস্থাবান চতুর বানর, কি আছে শরীরে তোমার
নুন মধু তেজস্ক্রিয় সুধা
হলুদ ড্রয়ার খুলে কোমলতা ও লজ্জা খোঁজা পাপ
আমি শুধু প্রশ্ন করতে পারি—কি কি ঘটে অভ্যাসবশত
চরিত্রের উত্থান পতন—অথবা ভুল পথে আরোহণাবরোহণের খেলা ?

রবীন্দ্র ঘোষ

শিমুলের ডালে আটক সময়

সময়টা এখন শিমুলের ডালে আটক,
সময়ের বাহারে রং ধরেছে ডালে, ডালে, গাছে, গাছে,
গাংশালিকের সাড়ায় জীবন্ত ফুল,
বেজাত পাখীরা মুখ গুঁজে ফেরে শিমুলের মেলায়,
কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁপি খুলে শিমুল উদ্দাম দিশাহারা,
সময়টা বাঁক নিয়েছে চাষীর শিমুল চোখে,

ভাষাহীন শিমুল আমার ঘরের টবে টবে স্থির।
পড়ন্ত রোদের ক্লান্তিতে ঘুমন্ত শিমুল
যখন চলে যায় রাতের গভীর আড্ডায়
জানেনা কখন ঘুমন্ত শিশুর কলার ধরা মুখ
নক্ত বুটের তেষ্টা মেটাতে হয়ে গেছে শিমুল
আচ্ছা এখন কি তোমাদেরও দেশে শিমুলের ডালে আটক সময় ?

কাল বৈশাখীর কশাঘাতে সুর মিলিয়ে ক্ষ্যাপা অক্টোপাসের
বাঁধন ছাড়াতে অকালে ঝরে পড়েছে তাজা শিমুলের দল,
শিমুলের শ্বাসরুদ্ধ চিৎকারে কেঁদে ওঠে সবার ঘর
—ভোরের তাজা শিমুল লটকে পড়ে রাতের কালো গাড়ী থেকে,
প্রাণ বাঁচানোর তীব্র চীৎকার স্তব্ধ হয়ে যায়
—মেঠো পথে যাবার বেলায় গরুর গাড়ীর চাকায়
রক্তাক্ত শিমুলের ব্যর্থ চীৎকারে।
আচ্ছা এখন কি তোমাদেরও দেশে শিমুলের ডালে আটক সময় ?

অবেলায় ঝরে পড়া শিমুলের শিশিরে ভেজা তাজা প্রাণ
—হবে কি ব্যর্থ দিনান্তের শেষ আঙিনায় ;
নাকি মেতে উঠবে শিমুলের খুশি করা আলোর উৎসবে
গ্রাম, শহর, নগর, বন্দর অথবা তুমি ॥
আচ্ছা তোমাদেরও দেশে কি এখন শিমুলের ডালে আটক সময় ?

রমা ঘোষ

তেমন ভয়ংকর দুঃখ পেয়ে

তেমন ভয়ংকর দুঃখ পেয়ে
কোন কোন মানুষ ঠিক মত বুঝে ফেলে
পার্থিব সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর,
তারপর ঋষিদের মতই
ক্রমশ বীতরাগ হয়ে গিয়ে
অবশেষে প্রাজ্ঞ হয়ে যায়।

তেমন ভয়ংকর দুঃখ পেয়ে
কোন কোন মানুষ
সমস্ত তরলতাকে হারিয়ে
এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পারে না।
এভাবে রক্তমাংসের মানুষ
কখনও কখনও জমাট পাথর হয়ে যায়।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ফিরে আসে শৈশব

তুমি দূরে সরে যাও
অনিন্দ্য সুন্দর আলো
ভরিয়ে দেয়না ভুবন
কেউ বুকে হাত তোমার মত
বিশ্বকে বিপক্ষ মেনে নিয়ে
ভাসিয়ে দেবে না নদী

তুমি গাজনের মেলায়
বাজছিলে বাঁশি মালকোষে
নোংরা বাসী তেল ফুটছে কড়ায়
বুকে উঠে এসেছিল বাতাস

আমার ঘোরা
প্রতিনিয়তই সান্নিধ্য তোমার শিশুকাল
বন্ধ দুই চোখ

দৃশ্যের পর দৃশ্য
তোমার মুখ ঠোঁট গর্বিত পদক্ষেপ
আজ গাজনের শেষ
শিমুলতলার মাঠে ভাঙ্গা মেলা
দুঃখময় বাতাস।

রাম বসু

বদ্ধ ঘরে পাখি ঘোরে

হাওয়া লাগে মুখে
আয়নায় বিব্রত ছায়া
বলিরেখা-বিহ্বল আকাশ
ঈশ্বর-প্রতিম মুখ নিরাসক্ত শবের কিনারে

পৃথিবীর নীচে
সমুদ্রের নীচে
পাঁজরের নীচে
কি রয়েছে কিছুই জানো না

খাদানের নীচে আলো ফেলে পা টিপে পা টিপে
যতই হাঁটো না
তোমার সীমানা
বড় জোর তোমার ছায়া-ই

বন্ধ ঘরে পাখি ঘোরে
ঘুরে ঘুরে চক্র গড়ে চক্র ভাঙে
হাওয়া লাগে
ঈশ্বর-প্রতিম মুখে

পিওন রোজই ত' আসে
চিঠিপত্র কিছুই থাকে না
কড়া নাড়ে তবু যেন অভ্যাসের দায়ে
আমার রক্তের ঘোড়া মরে গেছে কবে কোন কালে

দিনরাত
সরাই টেবিল খাট

নিসর্গ হয় না ঘর
দেওয়াল বিধবা

স্থির হলে
মেরুদণ্ড বেয়ে সাপ উঠে আসে মাথার ভিতরে
স্থির হলে
আমার কাচের ঘরে অবিশ্রাম বুলেটের গুলি
স্থির হলে
জড়িয়ে শবের গলা পড়ে থাকে সমস্ত ফরমুলা

বন্ধ ঘরে পাখি ঘোরে
ঘুরে ঘুরে চক্র গড়ে। চক্র মোছে··

বন্ধ ঘরে
তোমার নির্মল হাত
আমাকে জড়াতো যদি শিকড়ের মতো

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং আমি

ঝিনুকের মতো শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে—
সকালের আলো যখন জ্বলে ওঠে ;
শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুরতাকে উপেক্ষা করে আমি হাস্নুহানাকে চুম্বন করি।

আমার তিরিশ ছুঁই ছুঁই
ঈশান কোণে মেঘের অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলে
আমি মনের বিদ্যুৎগুলো
নিমেষে ছুঁড়ে ফেলে দিই প্রচণ্ড ঘৃণায়—
কৃষ্ণভয়াল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বিষাক্ত নর্দমায়।
আজকাল কোন স্রোতস্বিনী নদীর রূপালি ঢেউয়ে ;
সোনালি মাছ দেখতে পেলে আমি—

এবং আমি খুব ক্ষেপে যাই। কারণ
পৃথিবীতে এখন সোনালি মাছেদের সন্তরণের দিন ফুরিয়ে গেছে।
বিগত বিশ বছর ধরে আমি ক্রমাগত বাঁচতেই চেয়েছি
অথচ ভয়ংকর সব সরীসৃপেরা আমাকে বাঁচতে দিতে চায় না
তাই কখনো-কখনো হৃদয়কে অর্ধ—উলঙ্গ করে দিয়ে
মনের ইচ্ছাগুলোকে নির্মম ভাবে ধর্ষণ করে যাই।
পরিচিত কোনো এক অন্ধকার অরণ্যে মুখ রেখে
এখন তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চলেছি।
কারণ, আমি এবং আমি অজান্তে যতই পাতালে প্রবেশ করছি
ততই পৃথিবীকে বারবার আলিঙ্গন করতে ভালো লাগছে।
যাই হোক না কেন হে ভৃগুজাতক!
এখন আর আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত নই;
কারণ, আমি এবং আমি—
যখন তখন যে কোনো এক নক্ষত্রকে সাক্ষী রেখে
হাস্নুহানার জানুদেশে চুম্বন করতে পারি।

শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা

শ্রমিক

বাটালিতে কুঁদে গড়া পাথরের মুখের আদল
ওদের কঠিন মুখে। বুক বজ্র, বাহুর শাবল
হাতুড়ির চেয়ে শক্ত, রক্তে বাজে সাঁতালী মাদল।

পশুর অসাধ্য শ্রম কেঁদে কেঁদে হয় যে উত্তাল
অজস্র ঘামের নদী ওদের সর্বাঙ্গে চিরকাল।
ওদের শোণিতে জ্বলে সভ্যতার লোহিত মশাল।

ওরাই বাসুকী নাগ, কোনো যুগে প্রাগৈতিহাসিক
পৃথিবী মাথায় নিয়ে আজো ওরা বয়ে চলে ঠিক।
ওরা যদি রুষ্ট হয় পৃথিবী টলবে সাংঘাতিক।

শান্তনু দাস

ক্লাউন

মাষ্টারমশায়, নতুন করে আপনি কি পাঠ দেবেন?
আজকাল ব্লাকবোর্ডে চকখড়ি ঘষে গেলে
দাগটাগ উঠছে না মশায়,
চোখের জলের পাশে মুছে যাচ্ছে রোজ
জ্যামিতিক ত্রিবৃত্ত সংজ্ঞাগুলো আলফাগামা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বহুদিন হ'ল স্যার, সাজানো তাকের পাশে
পিতামহ পদাবলী, ক্লান্ত কাশীরাম।
মাষ্টার, নতুন করে শিখে নিতে হচ্ছে
ব্যাকরণ সংজ্ঞাটংগা গুলো।
বেঞ্চি থেকে উঠে এসে কারা যেন হাঁক দিচ্ছে
নীলডাউন
নীলডাউন
জমাট ক্লাসের থেকে চাবুকের শব্দ বুকে নিয়ে···

···দরজায় ষ্টাণ্ডআপ কাটা ক্লাউন।

শান্তনু গুহ

একখানি নষ্ট ইতিহাস

ঐখানে রেবতী মিত্র শুয়ে আছেন মৃতদেহ তাঁর
যাদুঘরে মমির মতো করে রাখা কাঁচে ঘেরা বাতাসের
যেই কাঁচ পার হয়ে সম্রাট ইথারের কাছে তিনি স্বচ্ছতর
আলো বছরের দূরত্বে নবতম দূতের মতো বিনীত
পরিচয়পত্র ধরা হাতে
অথচো ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট তাঁর
তেম্নি মোড়ানো আছে কনভোকেশন ফটোর জন্য স্মিতহাস্য
তেম্নি অটুট

স্বনাম ছাপানো প্যাড এখনো পাতার পরে শাদা পাতা
উল্টে দেখেছি আমি
লেখা আছে রেবতী রেবতী…
এরকম মনে হয় আমার পৃথিবীতে
রেবতী মিত্র ছাড়া আর কেউ নেই
আমি রেবতী তুমি রেবতী সেনাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত মন্ত্রীমহোদয়
রেবতী এঁরাও
একদিন মমির মতো নামগোত্র পরিচয়হীন

শ্যামল মজুমদার

একটি ফুলের মৃত্যু

সেদিন বলেছিলে—হৃদয় উজার করে কি কথা বলবে যেন,
এবং ফুলের মালা জড়াবে হৃদয়ে নাকি কোন এক ভোরে,
সেই আশা নিয়ে, উজ্জ্বল সমুদ্রে তাই আজো ভেসে যাই
প্রেম প্রেম খেলা খেলি বেহুলা ভেলায় দীর্ঘ একা একা।
তবুও দেখেছি আমি প্রথম উষার আলো পুবের মিনারে
প্রথম কমল ফোটে যৌবনের ধারে।
অতঃপর বেড়ে গেলে বেলা—খেলা শেষ হয়।
কখন ঈশান কোণে মৃত্যুর ইশারা, চুরমার করে যায়
রঙিন আকাশগুলো ভেঙে। ডুবে যায় বিহ্বলার ভেলা।
আরো এক ঝরে যায় অন্য নাম ফুলের কোরক।

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

উত্তরের তারা

একটা স্থির চেনা নক্ষত্র আকাশে প্রত্যয়ে জ্বলছে।
কোন অলৌকিক কিংবা ব্যক্তিগত বন্যায়
ভেসে যাবে নিত্যকার অভিরুচি,
কথার সুচারু সমগ্র, নিক্তি তৌল সামাজিক বোধ,
এমন কি সামান্যতম ভালোবাসা, অস্তিত্বের খড়কুটো
তারপর ভেজা মাটির নরম পৃথিবীতে

যেন নতুন সংসার
নতুন বিধান মতো কায়ক্লেশে সুখ
পুনরায় যথাপূর্ব প্রাণান্ত গবেষণা
দেশজ মাটির গর্ভে বিদেশের বীজ
এবং ইত্যাদি।

শুধু সরস কৌতুকে
সব কিছু দেখে যাবে আবহ আয়ুর স্থির উত্তরের তারা।

শিবাজী গুপ্ত

এখন কোলকাতায়

এখন জীবন ক্রমশ ধারালো হয়ে উঠছে আমাদের
শহরের অমসৃণ রাস্তায় সটান শুয়ে নেই সজল কৈশোর
এই অবেলায় দেওয়ালের পোস্টারের মুখও ঈষৎ বেঁকে যায় ভয়ে
ভয়ে কিংবা ভাবনায় হয়তো বা আত্মকরুণায় ভেঙে পড়ি মাঝে মধ্যে
জটিল দেওয়াল চৌচির করে ফুটে ওঠে সয়তানের চাউনি
বিঘোষিত সরলতা টাল খায় বালিকার মুখে
বালকের চোখে
অসহায় ঋজুপথ অকস্মাৎ বাঁক নেয় কবরখানার দিকে
উথালিপাথালি হৃদয় নিয়ে হেঁটে যায় বয়স্ক সময়
যেন নিলাজ নাগর চলে রসিক নাগর হয়ে
কদাপি মানুষ মানুষী আর হাঁটবে না অন্ধকারে
যেহেতু চারদিকে ছড়ানো রয়েছে হিজিবিজি অসুখের কণা
এইখানে এই কোলকাতাতেই

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি আজ দুটি কবিতা লিখেছি

নিশ্চিন্ত ভাবে
ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়লুম,
একটা ভিখিরি—পয়সা চাইলে
নির্দ্বিধায় দিয়েদিলুম।
বাসে ভিড় ছিল
বিরক্ত হলুম না একটুও,
একটা সীট শূন্য হল
উদারমনে অন্যকে বসিয়েদিলুম।
চাকরাণী ছুটি চাইল
অবিলম্বে দিয়েদিলুম,
শুধু শুধু বকলো একজন
মন খারাপ হল না একটুও।
কারণটা কী তলিয়ে দেখলুম,
—আমি আজ দুটি কবিতা
লিখেছি।

সমরেন্দ্র দাস

কালবীজ

প্রসারিত দেহের ভিতর ঘর
মুখের নীচে আলো
সেতু পেরুলেই ও কার ধ্বনি
দুলে ওঠে রক্তের আধার।
পায়ের তলায় গড়িয়ে যায় জল
মাথার ওপর আগুন
উগ্র বাতাস ধা ধা হেসে
ছড়িয়ে যায় কেমন নিপুণ!

শরীর থেকে উঠতে চায় ও কোন্ ধ্বনি
ছলাৎ ছল্ ছলাৎ ছল্
পুরোনো রক্তে মুখ নামিয়ে
কোন্ ডুবুরি খুঁড়ে বেড়ায় নতুন ফসল?

দৃষ্টি অস্বচ্ছ আজ হিম কুয়াশায়
তবু জানি একদিন পেয়ে যাবো অমোঘ কালবীজ।

সিকান্দার আবু জাফর

হৃদয় নেপথ্যে রেখে

ইচ্ছের নির্মাল্য নিয়ে গঞ্জে হাটে ঘর থেকে ঘরে
পরিচিত গুপ্ত সুপ্ত নানাপথ আঁকাবাঁকা গলি,
রাক্ষস-জিহ্বার জলে কর্দমাক্ত নর্দমা কেবলি
সম্মুখে উলঙ্গ হয়ে আস্ফালন আঁকে ওষ্ঠাধরে,
বিতৃষ্ণা-জর্জর সেই বাধাবিঘ্ন পার হয়ে চলি
পেশীর চাবুকে জেগে নিরন্তর দুর্লঙ্ঘ্য দুস্তরে।
হৃদয় নেপথ্যে রেখে তীক্ষ্ণধার দৃষ্টির পাহারা
মেলে রাখি চতুর্দিকে নগ্নতরুকে পর্বত যেমন
আকাশ-রমণে লিপ্ত অবিচল দৃপ্ত অবারণ।
ধুয়ে দেয় লোকলজ্জা ভয়শূন্য বিকারের ধারা
রক্তে রক্তে গেঁথে যাই নরকের উলঙ্গ ইশারা
সর্ব অঙ্গ নগ্ন রেখে লজ্জাকে পরাই আচ্ছাদন
অন্ধকারে ক্ষুধাতুর বিদ্যুতের মত নেচে উঠি
অহোরাত্র বেশ্যা খুঁজে জীবনের সর্বপ্রান্তে ছুটি।

সিদ্ধার্থ পাল

স্মৃতিতে কৃত্রিম রক্ত

'রাজা মহাশয়,
রক্ত নয়, রক্ত নয়, রাঙা রঙ—'
শৈশবের নাটকীয় সংলাপ মনে পড়ে ;
স্মৃতিতে কৃত্রিম রক্ত ঃ
কাঠের স্থবির মঞ্চ, রাঙতার তরবারি
আলতার গাঢ় রঙ ঝরে
সাজা রাজা, ভুয়ো সেনাপতি
মন্ত্রীরা আনাড়ি
অন্দরে নকল রাণী, তবু অশ্রুমতী ঃ
অবিশ্রাম যেন ঝরে শৈশবের শিথিল নাটকে
আবেগের রক্তধারা
অকৃত্রিম লাল টকটকে।
একদিন নির্জনে এসে তাজা রক্তে, খাঁটি খুনে হাত ধুতে হয়।

রাজা মহাশয়,
রক্ত নয়, রক্ত নয়, রাঙা রঙও নয়
মঞ্চ তবু ভরে যায়
অত্যাশ্চর্য গাঢ় রক্তিমায়।

সিদ্ধেশ্বর সেন

পুনশ্চ

পুরনো বাড়ীটা একস্তূপ স্মৃতির মতো
পড়ে আছে

পার্কের চেহারা বদলে গিয়েছে

যেখানটা চটা-ওঠা বাসনের মতো
ফাটা জমি ছিল

তার ওপর একস্তর
অনির্বচনীয় ঘাস

ক্ষতের গায়ে প্রলেপের মতো
মরশুমী ফুল

গলিটা নিজের অতীত ভোলবার জন্যে
প্রাণপণ করছে

কিম্বা নিজের পুনঃসজ্জায়
খুশী দেখাতে চাইলেও

তার গলায় কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে
একটা পুরনো বাড়ী
থাম, কার্ণিশ
পলেস্তারা-খসা কিছু
চুণবালি

আর, মাঝে মাঝে মন্থর দুপুরে ভ'রে
পায়রার ডাক

একস্তূপ অগোছালো স্মৃতি—
নাড়াচাড়া দিয়ে
যা আবার দাহ
জাগিয়ে তুলবে ॥

সুধাংশু বাগ

জন্মদিন আমার মনের জীবন

বৃষ্টির শিশুরা হাসিতে টুপটাপ ঝরায় শিউলি…
বিদ্যুতি আকাশের ঘনকুন্তলে বেলফুল, নারীরা রাণীর ভূমিকায়।
ঝড়ো হাওয়ার যুবকেরা এলোমেলো
এফোঁড় ওফোঁড় ঘুরে বাজায় বাস্ততার বাজনা।
শুষ্ক বৃক্ষের বৃদ্ধেরা পাতা উড়িয়ে শীর্ণ শাখাপ্রশাখার মতো
হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, দীর্ঘায়ু।

আর জন্মদিনের কেক আলজিভে মিষ্টি হয়ে সুনিপুণ হাসে
কিংবা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঢোক গেলে।
শুধু শব্দময় সৌখিনতা, হ্যাপি বার্থ ডে···
অনন্ত উপহারের মাঝে তোমার উপহার, বাঁশের বাঁশি।
এরই মাঝে জন্ম, পুনর্জন্ম, আমার জন্মদিন।
আমি ফুঁ দিয়ে নিভিয়েছি সারি সারি মোম!

আবার ফিরে আসে জন্মদিন, বয়সের পূর্ণতায়
আমার বুকের বাতাস নিঃশেষ এখন, শব্দহীন শূন্যতায়···
সমস্ত বাতাস বাইরে এসে ভুবনজুড়ে খুঁজছে মনের জীবন!
আমি ফুঁ দিয়ে বাজাতে পারছি না বাঁশি;
আমি ফুঁ দিয়ে নেভাতে পারছি না মোম!

মোমের শিখায় এখন জন্মদিনে জ্বলে যৌবনের জতুগৃহ···
সুরহীন বাঁশি হাতে অগ্নিদগ্ধ আমি খুঁজি
মনের জীবন, কবিতার অনন্যা ঈশ্বরী!···

সুনীথ মজুমদার

জীবন

এই হাত
ছড়িয়ে থাকে পৃথিবী জুড়ে লঘু বাসনায়
এই পা
থাকে পরিশ্রমী চলাচলে
এই সময়
বোধের বন্ধনে, হাত ও পায়ের ব্যবহারে
কোনো কিছু থাকা না-থাকার সংঘর্ষে
রক্তসংক্রামণ চাপবৃদ্ধি চাপহ্রাস
এভাবেই একদিন কোনোদিন কোনোখানে
এই হাত এই পা এই সময় এই রক্ত
ছোট হতে হতে একটা বিন্দু
বিন্দু

বড় হতে হতে বড় হতে হতে একটা সূর্য
সূর্য ছোট হতে ছোট হতে হতে
বিন্দু
এই ভাবে·

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিসর্গের পাশাপাশি

সিংহাসন থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে
ছারপোকা
লেলিহান আগুন প্রদক্ষিণ করে সে
রক্ত সমুদ্রের সামনে
বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ
হালকা হাওয়ার মতন মৃত্যুকে অনুভব
করার আমেজে চোখ বুজে আসে।
তখন বারুদ রঙের মেঘের আড়ালে ডুবে সঙ্গে সূর্য
একটা কাক লুঠেরার মতন তীব্র চোখে
চতুর্দিক দেখে নিয়ে উড়ে যায়
সেই সূর্যের দিকে
পৌঁছাবার আগেই অন্ধকার নেমে আসে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়
নারীর অহমিকার ওপর আস্তে আস্তে কুয়াশা জমে
কুয়াশার মধ্যে নিঃশব্দে খেলা করে যৌবন।

সুভাষ সরকার

মৃত আত্মাদের খোঁজে

"Here we have to find the darkness
Here we have to search the dead souls"

ঈগল পাখির মত আমাদের এই অনুসন্ধান বংশপরম্পরায়
আমরা ক্রমশ অন্ধকার থেকে ছুটে যাব পর্যাপ্ত আঁধারের দিকে
আমাদের বংশধরেরা নতমুখ কোরে শ্রদ্ধাজানাবে আমাদের
আমরা ক্রমশই হ্রদের দিকে ছুটে যাব মৃত আত্মাদের খোঁজে

এই পুরাতন হ্রদে পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই এক একজন হত্যাকারী
আমরা প্রত্যেকেই সশব্দে ছুটে যাব আমাদের বংশপরম্পরায়
হ্রদের ভিতর আমরা খুঁজে পাবো অজস্র মুণ্ডহীন কিম্ভূতকিমাকার

তারপর ক্রমাগত প্রযত্নের ভিতর থেকে ছুটে যাব আর এক প্রযত্নে
রক্তের মত ক্রমশ মিশে যাবে অতৃপ্তি আমাদের অন্তর্গত শরীরে
আমরা ক্রমশই হ্রদের ভিতর ছুটে যাব মৃত আত্মাদের খোঁজে।

সুশীল রায়

পিপাসা

প্রচুর তৃষ্ণার সঙ্গে যত বার হয় কোলাকুলি
পিপাসার স্বাদ নিতে, কী আশ্চর্য,
বার বার ভুলি।
আর যার যার সঙ্গে দেখা হয় ঘনিষ্ঠ নিবিড়,
পাইনে তাদের, মনে হয়, উপস্থিতি সশরীর।
অথচ যখন তুমি আস' কাছাকাছি
মউচাকে ঢিল পড়ে ; অকস্মাৎ হয়ে উঠি
মত্ত মউমাছি।

আকণ্ঠ কিসের শুষ্ক অনুভূতি পীড়া দেয় যত,
মনে মনে উচ্চারণ করে চলি প্রার্থনার মত
সখা যদি না'ই হও, সঙ্গী হোয়ো
সর্বদা অন্তত।
কিন্তু মধুচক্র ব'লে যার পরিচয় ভূ-ভারতে
তাকে পরিহার ক'রে তার আত্মীয়তা পাবে
কোন্ শাস্ত্র মতে ?
তুমি কাছাকাছি আস' যখনি, পিপাসা,
মত্ত যেন না'ই হই, নিবিড় আশ্লেষে পাই
—এই শুধু আশা।
যতদিন তুমি আছ ততদিন আছি,
অতএব থেকো কাছাকাছি॥

সৈয়দ কওসর জামাল

কে সেই সাহসী সৈনিক

এমন দারুণ শীত আসেনি কখনো কলকাতার বুকে
জলের গভীর থেকে উঠে আসে যেন আর্ত দুপুর—
সিক্ত চুল তুমি মেলে ধরো রহস্যের কাছে
চিঠির বাণ্ডিল খুলে চেয়ে দ্যাখো দুঃখময় স্মৃতির অস্তিত্ব
তোমার সমস্ত কাজ পড়ে থাকে কুমীরের পিঠের মতন
সাবলীলভাবে আমি জানাই, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন নয়কো এখন
এক্সপ্রেস ট্রেনের দ্রুতগামী শব্দ শুধু, একটু অপেক্ষা করো তুমি
লোকাল গাড়ির মত ভালোবাসা ধীর পায়ে এলে
পকেটের রুমাল খুঁজে মুছে নেবো সব জটিলতা,
এখন কলেজ স্কোয়ার ছুঁয়ে চলে যায় প্রলম্বিত বৃক্ষছায়া
তোমার শাড়ির আঁচল শুকায়নি এখনো—তুমি শুধু
তাবিজের মত জীবন রেখেছো বেঁধে বাহুর উপরে—
একটু সময় চাই আমার, তারপর দেখে নেবো কে সেই
সাহসী সৈনিক—অস্ত্রাঘাতে রুগ্ন করে পবিত্র সময় আমার।

স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশ

চিরন্তনী বাংলাদেশ আশৈশব ঘিরে আছে স্মৃতি
কত নদী প্রান্তরে, ধূ-ধূ বালুচরে
কদম্ব কেতকী বনে কত ফুল কেশভারে নত।
মুখরিত পাখি ডাকে, দূরে নদী বাঁকে
ঘরে ফেরা নৌকাখানি সন্ধ্যায় তুলে দেয় পাল।
খেয়াঘাটে দুইবেলা, কোলাহল মেলা ভিড়
সবুজের সমারোহে হৃদয় যে মূর্ছিত মাতাল।
বুক ভরা যার মধু, স্নেহময়ী মাতা বধূ
দারিদ্র হলেও হাসি মুখে ঘরে ঘরে।
খাঁচা ভাঙা শত পাখি, কলরব ডাকাডাকি
প্রফুল্ল কমল শত দুধ সরেবরে।
হাটে জনসাগমে, আনন্দ আসর জমে
সন্ধ্যাশেষে আড্ডা ঘন তাসে।
নিত্য আসে ঘুরে ফিরে, বাংলাদেশ স্মৃতি ঘিরে
সোনার ফসল ফলে আজও।

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

সমর্পণ—শুধু এইটুকু দিতে পারি, আমি পুরুরাজা নই,
যদিও একান্ত বিজিত, গম্ভীর দুন্দুভির স্বরে
বলে উঠবো, রাজকীয় ব্যবহার আমার প্রত্যাশা।
পৃথিবীতে কিছু লোক থাকে যারা চিরকাল হেরে যায়
আমি তেমন একজন খুব সাধারণ।
সুতরাং, মেয়াদী সঞ্চয়ের
পরিকল্পনায় সাজানো গৃহস্থালি, দক্ষিণের গোয়াল ঘরে
গোশাবক, গাভী—এসব কোথায় পাবো ?

কে না জানে বাউণ্ডুলেরা স্বপ্নের সাজানো সংসারে যাযাবর।
জানি এরকম ছুতো মার্জনীয় নয় পরাজয়ের সময় যখন
হেরে যাওয়াটাই দণ্ডণীয় অপরাধ, তবু
হেরে যেতে ভাল লাগে,
এই অহংকার, ক্রোধ এবং প্রকাশ এক এক করে বিলিয়ে দেবার পর
সমর্পণ—শুধু এইটুকু দিতে পারি এখন তোমাকে।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

যৌবন

নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলে কেউই আসবে না হয় না

দিনের বেলায়
সান্ধ্য আইনের স্বেচ্ছাচারে অন্ধকার চারিদিক,
আড়ষ্ট সং কোন মতে পার হয়ে চলে যায়
গাণপত্য জীবনের ঢেউ
অথবা জিজ্ঞাসাবাদে বেকুব মার্জার বাহাদুরী,
অফিসার কনষ্টেবলের যতেচ্ছ গ্রেফতারে
নাগরিক বিড়ম্বিত—
হাত তুলে নিয়ে যায় দিন বা রাত্রির শবদেহ
প্রত্যহ প্রত্যহ প্রতিদিন একটানা এমন জীবন।

তবু নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলে কেউই আসবে না হয়না
নিষেধ ভঙ্গের তাড়নায়—
সম্মিলিত টাটকা যৌবন আর তার দারুণ প্রদাহ
ছিটকে বেরিয়ে পড়ে এমন সময়
অথবা চকিত শহরে আসা বা
আনকোরা কেউ একজন
নিয়ম না জেনে অকস্মাৎ গুলি বিদ্ধ হয়।

তবুও তোমার নামে

দুঃশলা তুমিও থাকো
অনন্তর প্রশ্নের শিহর
মহাভারতের সেই প্রাচীন কবরে ;
হিংসা প্রেম অশ্রু কিংবা
শৌর্য বীর্য কিছু অন্য নয়
কোন প্রহসনে
শুধু এক উচ্চারণ ক্ষীণ
গান্ধারীর স্নেহালু নয়নে
অরব ব্যথিত স্মৃতি কোন এক ভোরে।

প্রান্তরে অনেক রোদ
বৃষ্টিধোয়া নরম সকাল
ছায়াঘন বন,
মেঘের নীলিম সীমা
ভাষাহীন রক্তিম মুখর
অনেক ঘোষিত আসা যাওয়া
কালের নির্মম চষা মাঠে।

তবুও তোমার নামে
শব্দহীন ইতিহাস মূক,
জিজ্ঞাসারা আলোড়িত ফেরে
ধ্বনিময় নিমীল আঁধার,
অবান্তর শুধু নাম এক
তুমিও দুঃশলা—।

বিদেশী ভাষা থেকে ঃ

ফরাসী

সাঁ-ঝঁ প্যার্স্ (SAINT JOHN PERSE)

[স্যাঁ-ঝঁ-প্যার্সের জন্ম হয় ১৮৮৭ সালে ক্যারিবিয়ান সাগরের গুয়াদলুপ দ্বীপে। এঁর আসল নাম আলেক্সি স্যাঁ-লেজে লেজে। ইনি ফরাসী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে চাকুরী থেকে বরখাস্ত হবার পর ১৯৪০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং এখনও সেখানেই বসবাস করছেন। এঁর কবিতার বিশেষত্ব হল মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা। বিচিত্র ও অপ্রচলিত শব্দসম্ভার এবং যথেচ্ছ বাক্যবিন্যাস। মানুষের বিশ্বপ্রকৃতি ও নিজেকে আবিষ্কারের মহান্ প্রচেষ্টা থেকে ইনি কাব্যের বিষয়বস্তু আহরণ করেন]

১ গান

যখন আমার ঘোড়া থামলো ঘুঘু-পাখি-ভরা গাছটির
তলায়, শিস্ দিয়ে উঠলাম আমি—এমন পবিত্র সে শিস্—
যে তাতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই ঐ বেলাভূমির জন্যে—যাকে
ধরে রাখে এই সব নদীগুলি (প্রত্যুষে জীবন্ত পল্লবগুলি যেন
খ্যাতির চিত্রকল্প)···

এবং একথা সত্য না যে মানুষ দুঃখী নয় ; কিন্তু
দিন শুরু হবার আগে ঘুম থেকে উঠে, এক প্রাচীন বৃক্ষের
বাণিজ্যে নিজেকে বিচক্ষণভাবে ধরে' রেখে, অন্তিম নক্ষত্রের
উপর চিবুক দিয়ে ভর করে, উপবাসী আকাশের গভীরতায়
সে দেখতে পায় অনেক মহৎ পবিত্র জিনিষ—যারা আনন্দে
ঘূর্ণ্যমান···

যখন আমার ঘোড়া থামলো কুহুস্বনা গাছটির
তলায়, শিস্ দিয়ে উঠলাম আমি—পবিত্রতর সে শিস্
···আর শান্তি পাক্ সেই মুমূর্ষুরা, যারা দেখে নি এই
দিনটিকে। কিন্তু খবর এসেছে আমার কবি ভাই-এর কাছ
থেকে। সে লিখেছে আর এক সুমধুর বিষয়ের কথা।
এবং সে কথা আগেই জেনে ফেলেছিল কেউ কেউ···

২ যাত্রী

মহত্তম নৈঃশব্দ্য আছে জনাকীর্ণ দেশগুলিতে, যে দেশে
দিবপ্রহরে পতংগের বাস।
আমি যাত্রী, তুমিও যাত্রী। বনৌষধিতে ভরা এক
অসমভূমির দেশে—যেখানে রৌদ্রে বিছানো আছে রাজন্যদের
ধৌতবস্ত্র।
আমরা পদদলিত করে যাই সম্রাজ্ঞীর জালিকাটা পোষাক,
যার দু'দিকে দু'টি পাটল বর্ণের দাগ (আহা ! নারীর অম্লদেহ
কেমন করে' পোষাকে দাগ ধরায় বাহুমূলের নিম্নাংশে !)।
আমরা পদদলিত করে' যাই রাজকন্যার জালিকাটা
পোষাক, যার দু'দিকে দু'টি উজ্জ্বল বর্ণের দাগ (আহা !
গিরগিটির জিভ্ কেমন করে' পিঁপড়েদের জড় করতে পারে
বাহুমূলের নিম্নাংশে !)
এবং সম্ভবত এমন দিন কাটে না, যেদিন একই
পুরুষ কোন নারী ও তার কন্যার জন্য দগ্ধ না হয়।
মৃতদের সর্বজ্ঞ হাসি, আমাদের জন্য কেউ ছড়িয়ে দিক্
এই ফলগুলিকে !···সে কী ! বন্য গোলাপের নীচের
পৃথিবীটাতে কি আর কোন লাবণ্য নেই ?
পৃথিবীর এই পাশে জলখণ্ডের উপর আসছে এক
রক্তনীলবর্ণ ব্যাধি। সমীরণ উঠে পড়ছে। সমুদ্রসমীর।
আর ধৌতবস্ত্র উড়ে যায় ! ছিন্নভিন্ন পূজারীর মত···

অনুবাদ—সুনাত গংগোপাধ্যায়

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

ফারসী

মিরজা গালিব

[ঊনিশ শতকের বিখ্যাত ফারসী কবি মিরজা গালিবের কলকাতা/বাংলাদেশের ওপর রচিত দুটি কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটি, একটি প্রবন্ধে গালিব নিজেকে সম্বোধন করেই লিখেছেন।]

মিরজা গালিবের কবিতা

১

বন্ধু হে,
কলকাতার কথা বল যেই ঃ
হৃদয়ে গভীরে বেঁধে তীর—
সবুজের শেষ নেই, নেই
মনটানে সুন্দর নিবিড়।
তার নাগরিক ছলাকলা।
(শকুনেরা অন্ধ হোক, হোক)
এবং বলিষ্ঠচালে চলা।
স্তব্ধ করে চাটুকার স্তোক।
স্নিগ্ধরস সবুজ ফলের
স্বাদ মধু—খাঁটি মৌয়ের ॥

২

হে গালিব—
প্রতিটি স্বরলিপিতে থাকে
সংগীতের আপন সুর ঝংকার
পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আছে
তার নিজস্ব পরিপার্শ্ব ;
আমি সহস্রার বেদিমূলে বসে
সেই ঘ্রাণ সংরক্ষণ করি
যা নাকি বাংলার
আশ্চর্য জলবায়ু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ইংরেজী থেকে অনুবাদ—শিপ্রা আদিত্য

গুজরাতী

রাজেন্দ্র শাহ

গায়ত্রী

১

হলো বিহঙ্গকল্লোলিত প্রভাত
উন্মীলিত হলো আমার নিকেত নয়ন।
আজ প্রাঙ্গনের শেফালি তলায় দেখেছি তোমাকে
অরুণবসনা স্মিতোজ্জল গৌর মুখ
গতি ভঙ্গীমাতে যেন জ্যোতির্ময় ছন্দ
ঋক্
সদেহ গায়ত্রী।
আদিত্যের বরেণ্য আশিস
বহন করিছে নেত্র নির্নিমেষ
কল্যাণতম রূপ
ঋজু তেজ…
তেজোময়ী!
মধ্যাহ্নের তপ্ত মরীচিকা
পদ্মপত্র সম শীত নীল
দিগন্তের গোধূলি-ধূসর অন্ধকার
অনন্ত আভায় ঝলমল।

আজ হৃদয়ের স্পন্দ
শাশ্বত তোমার
জ্যোতির্ময় ছন্দ।

২

শেফালিকার সুগন্ধ
ঘুরে ফিরে আসছে
আসছে ভেসে মৃদু কুহরণ গান
আমার লোমে লোমে সজাগ রয়েছে কান।

সুরভির সুর রূপ নিলে ঝলমল দ্যুতি…
অরুণিমার আঁচল
আভাময় তব রূপ
স্মিত

যার নয়নে সহিছে শিহরণ
সহিছে বাতাস, বইছে হিল্লোল
চতুর্দিক তোমার সুগন্ধ
সুগন্ধ…

৩

নাই নিকেতন
না দেওয়াল না দ্বার
নিগমন
প্রাঙ্গনের অবকাশ
বিহঙ্গকূজন নাই
নাই শেফালিকা
নিলয়ন
যেখানে দেখেছি তোমাকে
হে বরেণ্য গাত্রি!
আমিও এখন সেখানে
আভাময় ঘন রাত্রি
রহস মিলন
তুমি
না তুমি
না আমি
বিগলন
অনাহত আনন্দ ছন্দের
প্রভবন।

অনুবাদ—সুশ্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা

১

চার প্রেমিক চার ভুবন

সমসাময়িক কবিতায় হরদম পরীক্ষানিরীক্ষা চলে, চলতেই থাকে। আর চলাটাও স্বাভাবিক। বাংলা-কবিতার বাজারে এম্নি এক পরীক্ষা-টরীক্ষা চলছিলো বেশ কিছুদিন আগে। কিছু তরুণ ষাটের কবি দলছুট্ হয়ে কবিতায় বিশেষ কোনো নিয়ম না মেনে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করলেন। একদিন দলের একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম—মশায়, আপনাদের মূল ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলুনতো, কি ভাবছেন? উত্তর যা এলো, তার মোদ্দা মানে দাঁড়ায় এই-যে, খোলা আকাশের মতো হবে কবিতা, সে চলবে আপন গতিতে, ঠিক মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখনা মেলে। সেখানে না থাকবে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম, না থাকবে ছন্দের কোনো বাছাবিছার। কবিতা হবে এই নিঃশ্বাসের মতোই। এই ডামাডোলে পরিচিত এক কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম। আওয়াজ মৃণালের। মৃণালকে এ দলে বড্ড বেমানান বলে মনে হ'ল। ও যেন জোর করে অপরের শার্ট নিজের শরীরে জড়াতে চাইছে। এই সময়ই মৃণাল লিখলো —কেন/ঝড়/কবে,কাল/একা/একা/বাবা/ভালো/ভাই/ভালো/তুমি/আছি/ঠাণ্ডা/খুব……ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মৃণালকে দেখেছি অন্য চেহারায়। যন্ত্রণা-কাতর শহরে সে এক যুবক, যার বুকে প্রেম আছে, আছে বিষাদ, আছে চলার ছন্দ। মৃণালইতো রাসবিহারী এভিন্যু থেকে হুট্ করে বাসে উঠে বেমক্কা রাস্তায় ফাগুনের কৃষ্ণচূড়া দেখে লাফ দিয়ে নেমে এলেই যেন ওর বুকে শব্দ জড়ো হয়—চলতে চলতে থামলেই শব্দ/প্রতিকূল হাওয়া লেগে আগুন নিভলে/সমস্ত শরীর জুড়ে শব্দ/শব্দ শব্দ।' এইখানেই মৃণাল, শহর কলকাতার কবি। কারণ—এখানেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ম্লান ঘণ্টাধ্বনি/হরিণ শিশুর কাছে বিপন্ন ময়ূর/হারানো পাখির হাড়।' মৃণাল মূলতঃ রোম্যান্টিকতায় বিষাদমগ্ন। তাছাড়া আজকের জীবন যখন জটিল সমস্যায় ঘেরা তখন এ মুহূর্তে জীবনকে দ্বন্দ্বহীন, অন্ধকার বিমুক্ত ভাবি কি করে। তবু এই জীবনকেই হৃদয়ে রেখে রোম্যান্টিক কবিরা নিজস্ব অনুভূতির একটা জগৎ গড়ে নেন। তাই মৃণাল যখন এই সময়ের উপর দাঁড়িয়ে বলে—কেবল আমিই বুঝি কোনখানে লুকানো পেরেক/ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় জুতোর ভেতরে।'

তখনই কবি আমাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। তাছাড়া আমাদের সম্বায়ের বুকের মধ্যেই একটা চাকু নিয়তই ক্ষতবিক্ষত করে যায়। যদ্দিন করে তদ্দিনই কবিতা টবিতা হয়। তদ্দিনই কবির কলমের দিকে চেয়ে থাকি। আর ততদিনই আসামের এক অনন্য সুন্দর মালভূমির তরাইয়ের পথে হঠাৎ শহর কলকাতার কবিকে দেখলে খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না।

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপারটা অন্য। ভদ্রলোক থাকেন মফঃস্বলে। ট্রেন ধরে কফি হাউসে আসেন। কাপড়, গলা পর্যন্ত বোতাম দেওয়া শার্টে, লাজুক মুখচোরা তাই কবিতা পড়ে তাকে চিনতে অসুবিধে হবে কারণ ব্যবহারিক জীবনে যতটা কবি যতটা আনস্মার্ট ; কবিতা ঠিক উল্টো। তুলসী ছন্দে নিপুণ চিত্রকল্পে নিবিড়। সমাজসচেতন নাগরিক কবি যখন বলেন—বেলাশেষের সরকারী সমন ছাড়াই/বরফ কুচির মতো কারফু নামে শহরের বুকে।' তখন কলম তুলে খানিকটা ভাবি। আর তখনই কবি বলেন—'জীবন যেন জীবনযাপনের খাসকামরার বেয়ারা/উর্দি টুর্দি পরে ঢাকের মাথায় ঢুলছে/ঘণ্টা টিপলেই হুজুর—সেলাম।' তুলসীর কাছে ভালবাসা প্রেম, জীবনযাপন সবকিছুর মধ্যেই প্রচণ্ড আক্রোশ কবিতায় এসেছে তীর্যকভাবে যেমন—'ভালবাসা তো আর ক্যাম্বিস বল নয় যে ছুঁড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল/কিংবা কোনো পার্সেলটার্সেলও নয় যে/ডাকবাক্সে ফেলে দিলেই—ব্যস!/ছন্দ তুলসীর হাতে। পরিণত মনটাও। তাই ছবি আঁকা হচ্ছে পরপর। তবে একটা কথা না বললেই নয়—যে, অতিকথন কবিতাকে দারুণ মারে—তুলসী সব কথা বলার পর অনেক কবিতায় মনে হল আরে কবিতা কোথায়? এতো কবির আত্মকথন! ব্যক্তিগত ব্যথা বেদনাকে সার্বজনীন করতে গেলে আরেকটু উঁচু ধাপে তোলা প্রয়োজন। তাই নয়, তুলসী?

পঞ্চাশ ষাট সত্তরের মধ্যে পলাশ মিত্রকে কোন্ দশকে ফেলবো? কারণ পলাশ মিত্র লিখেছেন আজ বহুদিন এবং তার পালাবদল ঘটেছে। শিশু সাহিত্যের পাতায় পলাশ মিত্রের নামটি অনেকদিনের। খুব সম্প্রতি তিনি আধুনিক কবিতায় এসেছেন এবং এসেই পরিচিতি লাভ করছেন দ্রুত। তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র 'জীবনানন্দ' থেকে শুরু বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় পলাশ মিত্র এখন আসর জুড়ে। অনেকদিন থেকে তাঁর মাটি তৈরীই ছিল শুধু তিনি

গাছ পাল্টে দিয়েছেন। 'ছায়া দীর্ঘতর হয়' কাব্যগ্রন্থেই তাঁর গভীর আর্তির সঙ্গে আমরা একাত্ম হতে পারি। কারণ আমরাও প্রতিদিন ক্লান্ত এক চড়ুয়ের মতো নিয়তই বুকের ভেতর/ছায়া দীর্ঘ/দীর্ঘতর হয়/চারিদিকে কী যে শূন্যতা/রাত্রি অন্ধকার/সর্পাঘাত/সমস্ত শরীরে তীব্র বিষক্রিয়া।' পলাশ মিত্র লড়ে যাচ্ছেন। তার লড়াই সমাজের অবক্ষয় ব্যক্তিগত দ্বেষ হায়নার মতো প্রেম ক্রোধ কৃতঘ্নতার বিরুদ্ধে। তার লড়াই গভীর অন্ধকার শূন্যতা শেষে আলোর উঠোনে যাবার। তাই কবির কণ্ঠে চিরকালের গান শুনি—অমৃত উৎসধারা মধ্যরাত্রির কালিমার শেষ ঃ প্রভাতের শুভ নির্মলতার মাঝখানে/ রক্তকমলেরই গান।' পলাশ মিত্রের সাম্প্রতিক লেখা ইতস্ততঃ যা দেখছি পড়ছি, তাতে যা মনে হচ্ছে 'ছায়া দীর্ঘতর থেকে সুরের ফারাক অনেকটা। তার সাম্প্রতিক কবিতা অনেক বেশী ব্যাপ্ত। তাই ছায়া দীর্ঘতর কাব্যগ্রন্থ পড়ে অনেকের পলাশ মিত্রের সম্যক সমীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবু কিঞ্জর জোর এটা সব সময়ই মালুম পাওয়া যায়। তাছাড়া পলাশ মিত্র পরিশ্রমী, আধুনিকতা সম্বন্ধে সজাগ তাই ভবিষ্যত তার জন্যে অপেক্ষামান একথাটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে কবিতা গল্প প্রবন্ধ ছড়া কিন্তু বাংলাদেশের উপর শুধু একজন কবির দ্বিভাষিক কাব্য সংকলন একটি নতুনতম প্রচেষ্টা। অমিত বসু বেশ কিছুদিন হল লিখছেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ সর্বাপ্রয় ছায়াতে কবি মনের যে ব্যাপ্ততার দেখা মেলে তার উত্তরণ পরবর্তী কবিতাবলী। বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানের উপর তার কবিতাগুচ্ছ একটি দলিলের মতো কাজ করবে—যখন পাতা উল্টে পড়ি—কি করে ভুলব এই পথে/কুমারী মেয়েকে পুঁতে পায়ে পায়ে এসেছি পালিয়ে/নতুন আশ্বিনে তারা চাষীর লাঙলে হবে সীতা/কি করে ভাবলে তা ?/ তখন কবির গভীর মননের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। আজকের বাংলাদেশে কবির কবিতাবলী 'বাংলাদেশ' জননী আমার সম্বর্ধিত হবে বলে আশা করি।

১। শহর ক'লকাতা—মৃণাল বসুচৌধুরী। অবায়। ক'লকাতা-৯ দাম দুটাকা।
২। অন্ধকারের প্রতিবাদে—তুলসী মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজান। ক'লকাতা-৯ দাম তিনটাকা।
৩। ছায়া দীর্ঘতর হয়—পলাশ মিত্র। মিত্রাণী। ক'লকাতা-১৬। দাম তিনটাকা।
৪। বাংলাদেশ জননী আমার—অমিত বসু। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী। ক'লকাতা-২৭ দাম একটাকা।

২

গল্পকারের কলমে একজন কবি

অরুণাভ দাশগুপ্তের 'সজনে নির্জনে আমি' কবিতা গ্রন্থটি বহু সমালোচিত যা অন্য কোন কবির ভাগ্যে কম জোটে। হাল আমলে যাঁরা আধুনিক কবিতা লিখছেন তাঁদের অনেকেই ছন্দের ব্যাপারটা যত্ন সহকারে পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু কবিতার মধ্যে কোন নিজস্ব লাইন বা পরিশীলিত শব্দ রাখতে পারছেন কৈ ? এমন কি সামগ্রিক কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতেও অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এদিক থেকে অরুণাভ দাশগুপ্ত ব্যতিক্রম। এবং এই দলে আরো কয়েকজন যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও খুবই কম।

অরুণাভ অস্ত্র কারখানার কর্মী। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার ঘণ্টা তাঁকে সেইখানেই থাকতে হয়! খাওয়া-দাওয়া সব ঐখানেই। বাইরে বের হওয়া যায় না। চারিদিকে বিশাল প্রাচীর। জেলখানাই বলা যায়। এই পরিবেশে বালার্ড ওভেন, ফ্লাণ্ট ফার্ণেস, ইত্যাদির সংগেই তাঁর সারাদিনের যোগসূত্র। এই পরিবেশে থেকেই অরুণাভ কবিতা লিখছেন—ভাবলে অবাক লাগে। কবিতার জন্য কবিতা লেখা নয়। যথার্থই শুদ্ধ কবিতা। এই জন্যেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব—

'এসবের পদ্ধতি নির্ণয়ে অস্ত্রশিল্প জানা চাই
প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষানবিশির'

যে রকম কবিতা নির্মাণে শিখে নিতে হয় শব্দ, ব্যঞ্জনার সুষম বিন্যাস।

'কি ভাবে বটলিং প্রেসে তপ্ত গোলা পিষে
মারণাস্ত্র রূপ নেয়'

অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রত্যয়, মনন, বিষাদ ইত্যাদি কবিতার বিষয়। ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করেন নি। অনির্বচনীয় বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছেন যা সার্বজনীন—চিরন্তন। সহজ শৈলীর গুণে অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। যখন বলেন—

'বকুল, তুমি বুকের কাছে এসেই কেন পাথর হলে ?'

অথবা, 'শুধু ভালবাসার জন্য তোমায় ভালবেসেছি'

অথবা, 'কিসের অসুখ তুমি দরজা খুলে হাট হাট দাঁড়াতে পারো না'
ইত্যাদি।

এই রকম গভীর আন্তরিকতায় সিক্ত হার্দ্য উচ্চারণ মনকে নাড়া দিয়েছে! এমন কিছু কথা যা ঋজু বক্তব্যে নিটোল ছন্দে প্রকাশ হয়েছে। এই আন্তরিক উপলব্ধি, বিশ্বস্ততা কবির একার নয়, সকলের।

প্রেম সম্পর্কিত ব্যাপারেও অরুণাভ দাশগুপ্ত দারুণ প্রেমিক। অনুভূতি-সিক্ত সরল সত্য সটান তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব।

'আসলে আমি খাঁটি প্রেমিক, প্রেমের আবার বেজাত কি হে,
প্রেম কি কারও তলব করা বান্দা—যে সে
হুকুম নামা বুকে সেঁটে রাত দুপুরে দোর আগলাবে?'

দেশ ভাগ হওয়ার পর অনেকেই চলে এসেছেন। স্মৃতির পাতা বাংলা-দেশের প্রবীন নবীন কবিরা অল্পবিস্তর উল্টিয়েছেন। অরুণাভ'র কণ্ঠ আলাদা, একান্ত নিজস্ব বাচন ভঙ্গীতে বেদনার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা সামগ্রিকভাবে সমাজ সচেতন হলেও ব্যক্তি কেন্দ্রিক। যখন বলেন,

'হায়রে আমার বালকবেলা, ভালোবাসার বসত বাড়ী
এসব এখন অথৈ স্মৃতির হাওয়ায় ওড়া শিমুল তুলো'

'হায়রে আমার বালকবেলা'। আমারও ছিল। এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে কোথায় যেন চলে যাই। সেই

ধানসিঁড়ি নদী, ধলেশ্বরী গাঙ। রূপসীবাংলার কথা মনে পড়ে যায়। কি সুন্দর—উপমা, প্রতীকী প্রয়োগ ভাব—ভাষার সুষম সাযুজ্য ইদানিংকালে তরুণ কবিদের কবিতায় খুব কম পাওয়া যায়।

অরুণাভ নিজস্ব স্টাইলে কাব্যিক। কবিতার দেহ গঠনের মুন্সীয়ানা সুন্দর। কোথাও আজে বাজে কথা নেই। সীমিত চিত্র অথচ কোথাও বুঝতে কষ্ট হয় না।

'সজনে নির্জনে আমি'র প্রচ্ছদ এঁকেছেন চিত্তরঞ্জন দে। তাঁর কাজ প্রশংসনীয়। বেগনী জারুলের বুকে সজন আমি, নির্জন আমি। সাদা-কালো বিচ্ছিন্ন চঞ্চল জটিল—আমি বাঙ্ময়।

—জীবন সরকার

সজনে নির্জনে আমি—অরুণাভ দাশগুপ্ত। কবিতাপত্র কলকাতা-২৬। দাম দু' টাকা।

থাক লক্ষ্মী যাক বালাই

এ হল মানুষের
আবহমান কালের প্রার্থনা।
কিন্তু যাক বললেই তো আর
রোগবালাই যায় না। তাকে বিদায় করতে হলে
চাই কুলোর বাতাস—ঠিক যে রোগের যে ওষুধ।

আমরা সেই ঠিক-ঠিক ওষুধেরই জোরে মানুষের রোগবালাই দূর করার কাজে লেগে আছি এক-টানা পঁয়ত্রিশ বছর। প্রায় তিন যুগ।

আমরা সমানে বানিয়ে চলেছি ১২৫ দফা ওষুধ, ইন্‌জেকশন, রাসায়নিক এবং আরও অনেক কিছু।

অসুখ থেকে বাঁচিয়ে মানুষকে সুখে রাখাই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ব্রত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

EIPC.PR.7 BEN

anyadin • winter [redacted] 1971-72

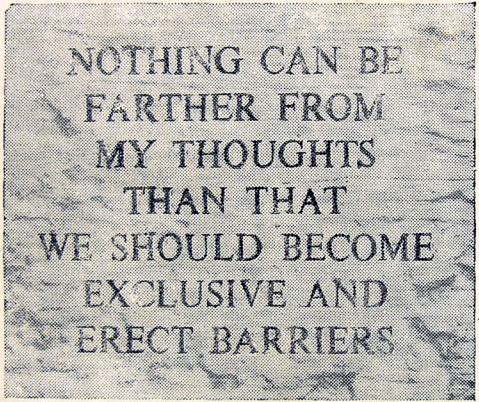

—M. K. GANDHI

MEMBER
IATA
QUALITY IN AIR TRANSPORT

Indian Airlines

LA-1277